ধূসর বিষাদ

পরিবেশক

দে বুক স্টোর

১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট

কলিকাতা- ৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ : ১৯৫৯

প্রকাশক
সমীরণ চৌধুরী
কলেজ স্ট্রীট পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

মুদ্রণ :
শ্রী দুর্গা প্রেস
১৭/৩/সি, ঝামাপুকুর লেন, কলি - ৯

বর্ণ সংস্থাপন :
লোকনাথ লেজারোগ্রাফার
৪৪এ, বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ শিল্পী
মদন সরকার

ধূসর বিষাদ

ভাস্বতী ভার গলায় বলল, চলে এলাম রে দাদা।

অন্য সময়ে এ কথা বললে বাড়িতে একটা খুশির হাওয়া বয়ে যায়। ভাস্বতী আসবে, ছেলেমেয়ে নিয়ে ক'টা দিন কাটাবে, এ তো খুব আনন্দের খবর। কিন্তু আজ ঘরটা কেমন থমথমে হয়ে গেল। বুঝি বা ভাস্বতীর স্বরেই তার আভাস ছিল।

হিমানী শুয়েছিলেন, ধড়ফড় করে উঠে বসলেন। ভাস্কর আর রিনা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে। এমনকী পিকলু যে পিকলু বুবলু মুনিয়াকে পেলেই উচ্ছ্বাসে লাফাতে থাকে, সেও পিসিকে দেখে থতমত।

ভাস্কর অবাক মুখে বলল, চলে এলাম মানে?

—চলে এলাম মানে চলে এলাম। এখানেই থাকব। পাকাপাকি। ভারী সুটকেসটাকে হিমানীর ঘরের এক কোণে ঠেলে দিল ভাস্বতী। আঁচলে মুখ মুছে বলল, ওর সঙ্গে থাকা আর সম্ভব নয়।

— কী হয়েছে তোদের? হয়েছেটা কী? হিমানীর স্বর দুলে গেল।

কী বলবে ভাস্বতী! পৃথিবীর সব থেকে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বনেদে কেন ঘুণ ধরে, কী প্রক্রিয়ায় তা একটু একটু করে ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়ায়, সেটা বোঝানো কি এতই সহজ! নিজেই কি সে বুঝেছে পুরোপুরি!

তবু জবাব তো একটা দিতেই হয়, না দিলে ছাড়ান নেই। অন্তত এই মুহূর্তে।

ভাস্বতী চশমার ব্রিজে আঙুল চাপল—বললাম তো, ওর সঙ্গে ঘর করা অসম্ভব।

ভাস্কর অসহিষ্ণু হল—কেন অসম্ভব সেটা বলবি তো?

— ও আর মানুষ নেই রে দাদা।

– অ্যাদ্দিন পর এটা কি একটা কথা হল বুলু? রণজয় করেছে কী, খুলে বলবি তো?

ভাস্বতী তক্ষুনি উত্তর দিল না। পায়ে পায়ে খাটে গিয়ে বসেছে। বিছানায় হিমানী এখন আধশোয়া, ষাট পার হওয়ার পর থেকে পার্কিনসনে ভুগছেন,

ইদানীং মাথাটাও কাঁপে, মেয়েকে দেখার পর থেকে কম্পন বেশ বেড়ে গেছে তাঁর। এখনই মার সামনে কাদা ঘাঁটাঘাঁটি কি না করলেই নয়! বুবলু মুনিয়াও সেই থেকে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে, পিকলুর চোখ গোলগোল, ওদের সামনেও কি আলোচনাটা সমীচীন? তবে এও ঠিক, বুবলু মুনিয়ার কিছুই অজানা নেই, আজ না হোক কাল পিকলুও জেনে যাবে সব, কার কাছে কী গোপন করবে ভাস্বতী!

তবু একটা সংকোচ আসেছে। সংকোচ, না সংস্কার?

ভাস্বতী চাপা গলায় বলল—বলছি সব। একটু জিরোতে দে। ...বুবলু মুনিয়া যাও তো, পিকলুদাদার সঙ্গে গিয়ে খেলা করো।

রিনাও যেন সচেতন হয়েছে এতক্ষণে। ব্যস্তভাবে বলে উঠল—হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমরা ও ঘরে যাও এখন। ...পিকলু, তোমার নতুন ক্যারামবোর্ডটা বুবলু মুনিয়াকে দেখাও। বলতে বলতে ননদের দিকে ফিরেছে ওদের কিছু খাইয়ে এনেছ নাকি... ?

খেয়েছে। ট্যাক্সিতে ওঠার সময়ে দু'জনকে দুটো টিফিন কেক কিনে দিয়েছিলাম।

—ওমা, শুধু টিফিন কেকে কি ওদের হয়! না না, ওদের খেতে দিই আগে। ..তুমিও তো নিশ্চয়ই...রিনা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

যাচ্ছে বাচ্চারাও। বড়দের দেখতে দেখতে। বুঝে গেছে, এই রহস্যময় গোপনীয় আসরে তাদের স্থান নেই। দরজায় গিয়েও ছুট্টে ফিরে এল মুনিয়া। ভাস্বতীর আঁচল ধরে দাঁড়িয়ে রইল একটুক্ষণ। তারপর বেরিয়ে গেল পায়ে পায়ে।

ঘরের হাওয়া আরও ভারী হয়ে গেছে। রবিবারের সকাল, চৈত্রের সূর্য এখনও আকাশের কাঁধ ছোঁয়নি, ভাস্করদের পাইকপাড়ার বাড়ির দোতলায় আলো বাতাসও খুব, তবু যেন এক গুমোট নেমেছে ঘরে, মৃদুমন্দ পবন থমকে আছে জানলার ওপারে।

ভাস্বতীর বুকে কষ্টটা ফিরে আসছিল। শুধু নিজের জন্য নয়, ছেলেমেয়ের জন্যও। বাবা মার লড়াই দেখে রাতভর সিঁটিয়ে ছিল মুনিয়া, ঘুমের মধ্যেও চমকে চমকে উঠেছে। বুবলুও কি ভয় পেয়েছে কম! নাহলে বাপের অত ন্যাওটা ছেলে এক ডাকে ভাস্বতীর পিছন পিছন সুড়সুড় বেরিয়ে আসে! গোটা পথ একটাও কথা বলেনি বুবলু, আধখানা কেক লুকিয়ে ট্যাক্সির জানলা দিয়ে

কাকে লুকোল বুবলু? মাকে? বোকা। বেরোনোর আগে বাবাকে

কী যেন বলতে গিয়েছিল বুবলু, বোধহয় যাচ্ছি বাবা, আসি বাবা ধরনের কিছু, কী বিশ্রী এক হুঙ্কার ছাড়ল রণজয়! যেন ছেলে নয়, রাস্তার নেড়ি কুকুরকে ঢিল মেরে খেদাচ্ছে। ছেলেমেয়ের ওপরও যার তিলমাত্র মায়া মমতা নেই, তাকে কি মানুষ বলা চলে!

ভাস্কর মোড়া টেনে বসেছে। ঘাড় ঝুলিয়ে। মাঝে মাঝে দেখছে বোনকে, আবার মাথা নামাচ্ছে। উঠে পাশের ঘর থেকে সিগারেট দেশলাই নিয়ে এল। হিমানীর সামনেই ভাস্কর সিগারেট খায় আজকাল।

সিগারেট ধরিয়ে ভাস্কর বলল, রণজয় কী করেছে তুই কিন্তু এখনও বললি না বুলু।

—কী বলি বল তো দাদা। ভাস্বতী লম্বা নিঃশ্বাস ফেলল, যা খুশি আরম্ভ করেছে এখন। নেশা করছে, চিৎকার, গালিগালাজ...বাড়িটা পুরো বস্তি হয়ে গেছে।

হিমানী সোজা হওয়ার চেষ্টা করলেন—কই, আগে তো কখনও এসব শুনিনি!

—এসব কি ঢেঁড়া পিটিয়ে বলার মতো কথা মা? বললেও কি তোমাদের ভালো লাগত?

—মদ তো রণজয় আজ নতুন খাচ্ছে না। ভাস্কর ঝপ করে বলে উঠল—হঠাৎ কী ঘটল যে...

—সব কিছুর তো একটা মাত্রা থাকে রে দাদা। আগে খেত, ন'মাসে ছ'মাসে খেত। বন্ধুবান্ধবদের আড্ডায় গেল, পার্টিতে গেল, একটু-আধটু খেয়ে এল...ঠিক আছে। সে আর কোন বাড়িতেই বা না খায় আজকাল। আড়চোখে একবার হিমানীকে দেখে নিল ভাস্বতী, কিন্তু বুবলুর বাবা যা শুরু করেছে, তা একেবারে মাত্রাছাড়া। রোজই প্রায় চুর হয়ে ফিরছে, এটা ভাঙছে, ওটা ছুঁড়ছে, প্রতিদিন হল্লা মাতলামি...গায়ে পর্যন্ত হাত চালিয়ে দেয়। দ্যাখ, কাল কী রকম মেরেছে দ্যাখ, সর্বাঙ্গে আমার কালশিটে পড়ে গেছে।

—কী বলছিস কী! আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। রণজয় চিরকাল একটু খ্যাপাটে, কিন্তু...। ভাস্করের তবু যেন ঠিক প্রত্যয় হচ্ছে না, হঠাৎ এমনি এসব শুরু করে দিল? ওর কি অফিসে কিছু প্রবলেম চলছে?

ভাস্বতী ঈষৎ আহত হল। দাদার কথা শুনে মনে হয় যেন অফিসে কিছু গোলমাল চললেই রণজয়ের এ ধরনের আচরণ স্বাভাবিক এবং যুক্তিসঙ্গত হবে

গোমড়া মুখে বলল, না দাদা, তার অফিস দিব্যি চলছে। অত নেশা করে এলে কি আর মানুষ সেন্সে থাকে? তার ওপর এখন আবার নতুন

বাতিকে ধরেছে। নতুন কেন বলব, আগেও ছিল। তবে এতটা ছিল না। ভাস্বতী আবার একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলল—সন্দেহবাতিক রে। সারাক্ষণ নোংরা নোংরা সন্দেহ মাথায় ঘুরছে। তুমি ওই ছেলেটার সঙ্গে কথা বলো কেন! ওর দিকে তাকিয়ে হাসলে কেন! অফিস থেকে ফিরতে এত রাত হল কেন! রাহুলকে তো তোরা দেখেছিস, বুবলুর জন্মদিনে এসেছিল, খুব ক্যারিকেচার করছিল...তনুশ্রীর ভাই...আমার থেকে ছেলেটা কত ছোট, আমার ভায়ের মত...তাকে নিয়ে পর্যন্ত কী ভাষায় যে কথা বলে তুই কল্পনাও করতে পারবি না দাদা।

ভাস্কর চুপ হয়ে গেল। ভাবিত মুখ, বিস্মিত চোখ, কুঞ্চিত কপাল। হিমানীও নিঝুম। তাঁর ধূসর চোখের মণি শঙ্কায় স্থির।

রিনা ফিরেছে ঘরে। ননদ বরের সঙ্গে ঝগড়া করে ছেলেমেয়ে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে এসেছে, এমন দৃশ্য থেকে নিজেকে বিযুক্ত রাখা তার পক্ষে কঠিন। ক্ষণিক নিস্তব্ধতাও তার পছন্দ নয়। দুঃখী দুঃখী মুখে বলে উঠল—তাহলে এখন তোমার কী হবে বুল্?

—স্বামী স্ত্রীতে এমন হয়ই। হিমানী বললেন—ক'দিন বাদে মিটমাট হয়ে যাবে, তখন চলে যাবে।

—না মা, আমি এখন থেকে এখানেই থাকব। অবশ্য তোমাদের যদি আপত্তি না থাকে।

—ওমা, আপত্তি হবে কেন? থাকো না যতদিন খুশি। এটা তো তোমারও বাড়ি। রিনার চোখ পিটপিট। যেন মাপতে চাইছে ননদের সিদ্ধান্তের গভীরতা। হাসি মুখেই বলল—কিন্তু তোমার ছেলে মেয়ের স্কুলের কী হবে?

এ-চিন্তাটা আগে ভাস্বতীর মাথায় আসেনি। কেন আসেনি! টেনশানে কি মানুষ বুদ্ধিভ্রংশ হয়! ছেলে মেয়ে দিব্যি স্কুলবাসে চলে যেত টালিগঞ্জ, কিন্তু এখন? পাইকপাড়া অবধি কি স্কুল বাস আসবে? মনে হয় না। নর্থ ক্যালকাটায় বোধহয় আসে না বাস। তবে ঠিক এই মুহূর্তেই অবশ্য সমস্যাটা নেই। সদ্য সদ্য স্কুলের পরীক্ষা হয়েছে, রেজাল্ট বেরোতে এখনও দশ পনেরো দিন, ক্লাস শুরু হবে আরও দিন সাতেক পর, এর মধ্যে কি কোনও একটা সমাধান বেরোবে না?

ভাস্বতী উদ্বেগটা প্রকাশ করল না। নিচু গলায় বলল—সে ভাবনা আমার করা আছে। কাছেই তো মেট্রো রেল, একটু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে মেট্রো ধরে ওদের স্কুলে পৌঁছে দেব। আবার অফিস থেকে ফেরার সময়ে...

—যাহ্, তা হয় নাকি ! রোজ রোজ দুজনকে ট্যাকে নিয়ে যাওয়া, ফেরা, পারবে ?

--পারতেই হবে। উপায় যখন নেই।

--মুনিয়ার সাড়ে তিনটেয় স্কুল ছুটি হয় না ? সে তোমার জন্য সাড়ে পাঁচটা ছ'টা অব্দি বসে থাকবে ? বাচ্চাদেব কিন্তু কষ্ট হবে খুব। তা ছাড়া ওদের স্কুলও তো মেট্রো স্টেশনের গায়ে নয়, অনেকটা হাঁটা !

ভাস্বতীর চোখ হঠাৎ জলে ভরে এল। নাক টানল জোরে জোরে।

চশমা খুলে দু'চোখের কোল মুছল। বাপ যদি চণ্ডাল হয়, ছেলেমেয়েদের কষ্ট পেতেই হবে।

হাঁটুতে মুখ গুঁজে ভাস্বতী বলল—তেমন হলে ওই স্কুল ছাড়িয়ে দেব। দাদার তো এদিকে অনেক জানাশুনো, কাছাকাছি কোনও স্কুলে ভর্তি করে দিতে পারবে না দাদা ?

--তুই আবার বড্ড বেশি বেশি ভাবছিস। ভাস্কর চঞ্চল মুখে উঠে দাঁড়িয়েছে। অস্থির পায়ে পায়চারি করতে করতে আরেকটা সিগারেট ধরাল—আমি কি একবার রণজয়ের সঙ্গে কথা বলব ?

--লাভ নেই দাদা। শুধু শুধু মুখ খোয়ানো।

-তা বলে চুপ করে থাকব ? ভাস্কর ঝাঁ করে তেতে গেল - মগের মুলুক নাকি, যা ইচ্ছে তাই করবে ! বিয়ের দু'মাস চার মাস পরে হলে নয় কথা ছিল। বিয়ের এগারো বছর পর...দু দুটো বাচ্চা হয়েছে...এই সময়ে ওরকম ইল্লুতেপনা সে করে কোন সাহসে ! আমার বোনের সঙ্গে মিসবিহেভ করেছে, আই ওয়ান্ট অ্যান্ এক্সপ্ল্যানেশন ফ্রম হিম। আমার বোনের গায়ে হাত তুলেছে, আই শ্যাল টিচ হিম আ লেসন। ভেবেছেটা কী অ্যাঁ ? ভেবেছেটা কী ?

রাগলে দাদার হিতাহিত জ্ঞান থাকে না, ভাস্বতী জানে। মাত্র বিয়াল্লিশে দাদার রক্তচাপ চড়ার দিকে, নিয়মিত ওষুধ খায়।

নার্ভাস গলায় ভাস্বতী বলল—আ দাদা, আস্তে। শান্ত হ। বাইরে বাচ্চারা সব শুনছে।

--শুনুক। আমি যদি রণজয় মিত্তিরের ঘেঁটি ধরে এনে তোর কাছে ক্ষমা চাওয়াতে না পারি, আমার নামে তুই কুকুর পুষবি।

--তুমি যে দেখছি শিশুদেরও বাড়া হয়ে গেলে ! সবে তো এল, ব্যাপারটা একটু থিতোতে দাও না। বুলুকে একটু একা থাকতে দাও। রিনা ঝেঁঝেঁ উঠে টানল স্বামীকে --এখনই লঙ্কাকাণ্ড না বাধিয়ে, যাও একটু বাজার থেকে ঘুরে এসো তো। বুবলুটা মাংস ভালবাসে, ওর জন্য একটু মুরগি নিয়ে এসো। আর মুনিয়াটার জন্য মিষ্টি দই।

ভাস্কর তবু ফুঁসছে—তুই আর একদম ফিরে যাবি না বুলু। তোর দাদা যদ্দিন জিন্দা আছে, দেখি তোকে কে অসম্মান করে। আজ থেকে বুবলু মুনিয়ার ভারও আমার।

ভাস্বতী এবার সত্যি সত্যি কেঁদে ফেলল। এইটুকুই তো চায় মানুষ। একটু সহানুভূতি, একটু বোঝাপড়া, একটু ভালবাসা। এটুকুও দিতে মানুষ যে কেন এত কৃপণ হয়!

ভাস্কর চলে গেছে বাজারে। রিনা রান্নাঘরে।

হিমানী কাঁপা কাঁপা গলায় মেয়েকে বললেন -মন খারাপ করিস না। সব ঠিক হয়ে যাবে।

ভাস্বতী শূন্য চোখে তাকাল--কী ঠিক হয়ে যাবে মা? তোমার জামাই বদলে যাবে? মদ খাওয়া ছেড়ে দেবে? সন্দেহবাতিক ঘুচে যাবে?

আরে বাবা, ঘটি বাটি এক সঙ্গে থাকলেও ঠোকাঠুকি লাগে, আবার মিলেও যায়। তুই দেখিস, সে যদি কোনও অন্যায় করে থাকে, ঠিক ভুল বুঝতে পারবে।

কী সরল ধারণা! জীবনের প্যাঁচপোঁচ কিছুই বোঝে না মা।

ভাস্বতী নিজেকে অন্যমনস্ক করতে চাইল। যদি কষ্টটা কমে। কান পাতল বারান্দায়। ফটাফট শব্দ হচ্ছে, ক্যারাম খেলছে বাচ্চারা। মালতীকে কী যেন বলছে রিনা, বোধহয় নতুন করে মশলা বাটার কথা। ঘরের দেওয়ালে চোখ বোলাল ভাস্বতী। কত কালের বাড়ি, প্রায় তিরিশ বছর হয়ে গেল, এখনও দেওয়াল মেঝে সিলিং কী ঝকঝকে। বাড়িটার ভারী যত্ন করে দাদা। ভাস্বতীর যাদবপুরের ফ্ল্যাটের অত ভাল প্লাস্টিক পেন্ট ছ' বছরে মলিন হয়ে গেল। শুধু অনাদরে, শুধু অবহেলায়। হাজার বার রণজয়কে বলেছে রং মিস্ত্রি ডাকো, কলি ফেরাও। মোটে আমলই দেয় না। ঘরের কোন দিকেই বা তাকায়! রান্নাঘরে টাইলস্ ফেটে ফেটে যাচ্ছে, বাথরুমের নর্দমা কথায় কথায় বন্ধ হয়ে যায়, গ্রিলের চটা উঠে কেমন খসকুটে মার্কা হয়ে গেছে, ব্যালকনির দরজার ছিটকিনি সেই কবে থেকে খারাপ, একটা দিকেও কি রণজয় নজর দিয়েছে কখনও! বলতে গেলে প্রোমোটারের দোহাই পাড়ে। শালা ভুসিমাল দিয়েছে! তাপ্পিতাপ্পা দিয়ে কিস্যু হবে না!

ঠিকই তো। তাপ্পিতাপ্পা দিয়ে কোনটাই বা চলে? সম্পর্ক? সংসার? অফিস দু'জনেই করবে, অথচ জোয়াল টানতে হবে একজনকে। দশভুজা হয়ে। ঘরেও, বাইরেও। কেন? ভাস্বতীর অফিস কি অফিস নয়? ছেলেখেলা?

বাবুর কাজের মধ্যে কাজ হপ্তায় দু'দিন বাজার, মাসে একদিন ইলেকট্রিক বিল, বছরে একদিন করপোরেশান ট্যাক্স ! পরের দুটো কাজ তো অফিসের বেয়ারাকে দিয়েই করিয়ে নেয়। সকালে ঘুম থেকে উঠে ঝাড়া একটি ঘন্টা চোখের সামনে খবরের কাগজ খুলে বসে রয়েছেন, এই মুখের কাছে চা ধরে দাও, এই সিগারেটের প্যাকেট এনে দাও, এই অ্যাশট্রে খুঁজে দাও। বলিহারি জিভ ! সীতার মা সব রাঁধলে হবে না, ভাস্বতীকেও রোজ একটা করে পদ করতে হবে। করতেই হবে। ভাস্বতী যেন দাসীবাঁদি, তার কাজ নাকে দড়ি দিয়ে সকাল থেকে শুধু ছোটা আর ছোটা। রান্নাঘরে যাও, ছেলেমেয়েকে তৈরি করো, নিজে রেডি হও, মাসে ক'টা দিন ঠিক টাইমে অফিস পৌঁছতে পারে ভাস্বতী ! ছুটির পরই বা ক'দিন দেরি করে ফিরেছে ! কার ভরসায় হাঁ করে বসে থাকে বুবলু মুনিয়া ! বাবা, না মা ? কে তাদের সন্ধ্যেবেলা পড়তে বসায় ! কে তাদের স্কুলে ছোটে ! ডাক্তার বদ্যি করে ! মাস পয়লায় ঘরে কিছু টাকা ফেলে দিয়েই বাড়ির কর্তার দায়িত্ব শেষ। সেই যে আল্লার নামে অফিস বেরিয়ে গেলেন, আড্ডা মেরে ফিরলেন রাতদুপুরে। মন হল তো সন্ধ্যেবেলা এলেন কোনওদিন। সংসারধর্ম করতে নয়, বউয়ের ওপর গোয়েন্দাগিরি করতে। নাক কুঁচকে, মুখ ভেটকে বসে থাকলেন, নয়তো বোতল খুললেন ছেলেমেয়ের সামনেই। শুধু মেজাজ বিকার আর অত্যাচার। এর নাম সংসার ? একেই টিকিয়ে রাখতে প্রাণপাত করে মানুষ ?

অসহ্য অসহ্য। ঘেন্না ঘেন্না।

॥ দুই ॥

দিনটা বড় বিস্বাদ ভাবে কেটে গেল। সকালে যে প্রচণ্ড বিতৃষ্ণা নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিল ভাস্বতী তা এখন অনেকটাই সরে গেছে। সারা দিন আর কেউ তেমন জেরা করে নি, দিব্যি মুরগি রেঁধে হৈ হৈ করে খাওয়া দাওয়া হল দুপুরে। যেন কিছুই ঘটে নি, যেন প্রতি বারের মতোই ভাস্বতী ছেলেমেয়ে নিয়ে বেড়াতে এসেছে কটা দিন। দু চার ঘণ্টা যেতেই বুবলু মুনিয়াও অনেক স্বাভাবিক, খেলছে, হাসছে ছুটছে, বিকেলে মামার সঙ্গে টালা পার্কের দিক থেকে বেড়িয়ে এল। সন্ধ্যেবেলা ভাস্করের বন্ধু কমলদা আর মল্লিকা বউদি এল, তাদের সামনেও কিছুই হয় নি এমন মুখ করে হাহা হিহি হল খুব।

তবু ভাস্বতী টের পাচ্ছিল কোথায় যেন তার ছিঁড়ে গেছে। এবারের আসাটা তার অন্য বারের মতো নয়, তাই কি অতি স্বাভাবিক ব্যাপারও চোখে কেমন কেমন ঠেকে? মনে হয় বুবলু মুনিয়ার স্বচ্ছন্দ ভাবটা বানানো, দাদা বউদির উচ্ছলতাও মেকি। সবই বুঝি ভাস্বতীকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য।

এলোমেলো ভাবনাগুলো বেপথু করে দিচ্ছিল ভাস্বতীকে। রাত্রে বিছানায় শুয়ে অন্ধকারে নিজেকে হাতড়াচ্ছিল ভাস্বতী। নিজের বর্তমানকে খুঁড়ছিল, অতীতকে উল্টোচ্ছিল, খুঁজছিল ভবিষ্যতকে। বর্তমান তার চেতনার মতোই ভোঁতা হয়ে আছে এখন, ভবিষ্যত রাতের অন্ধকারের মতো অজানা, বার বার শুধু ঝলসে ওঠে অতীত। এই তো সেদিন রণজয়ের সঙ্গে প্রথম দেখা হল। সেই যে, বাবা মাকে নিয়ে রাজগীর যাচ্ছিল ভাস্বতী, বক্তিয়ারপুরে ট্রেনের কামরায়...

ক' বছর হল? বারো বছর! এক যুগ! সময় এত দ্রুত ছোটে! দৃশ্যটা তো একটুও ঝাপসা হয়নি এখনও! নীল জিনস্ পরে ছিল রণজয়, সঙ্গে ঝকমকে টিশার্ট, চোখে পাঁচকোণা সানগ্লাস, গলায় ঝুলন্ত দামী ক্যামেরা। পাটনা বেড়িয়ে ফিরছিল রণজয়, সঙ্গে মামাতো ভাই প্রলয়, দুজনে রাজগীর ঘুরে বুদ্ধগয়ার দিকে যাবে। রণজয় তখন কী চৌখস! যেমন কথায় ওস্তাদ, তেমনি হাঁটাচলায় স্মার্ট...বার মার সঙ্গে পাঁচ মিনিটে ভাব জমিয়ে ফেলল এই ভাস্বতীদের ওয়াটার বটল্ নিয়ে জল ভরতে ছুটছে, এই দু হাতে ভাঁড় ব্যালান্স করতে করতে চা আনছে, কখনও বা বাবার পাশে বসে রাজনীতি

খেলাধুলো আর ট্রেনের সময়ানুবর্তিতা নিয়ে ঝাঁঝাল মতামত জাহির করে চলেছে। প্রলয়টা চিরকালের মুখচোরা, এখনও যা, তখনও তাই, সমবয়সী পিসতুতো ভায়ের লেজুড়টি হয়ে বসে আছে সারাক্ষণ।

তখনই কি প্রেম হয়েছিল তাদের মধ্যে ? উহুঁ, মুগ্ধ তো তখন ভাস্বতী হয়ই নি, উল্টে একটু যেন ওপরপড়া মনে হয়েছিল রণজয়কে। মনে মনে রণজয়কে তখন কি বলেছিল তাও ভাস্বতীর মনে আছে। চালিয়াত ! তবে হ্যাঁ, রণজয়ের হাবভাবে মজাও লাগছিল মাঝে মাঝে। তেইশ চব্বিশ বছর বয়সে যেমনটা লাগে আর কি। মনে হচ্ছিল রণজয়ের মধ্যে একটা ছেলেমানুষও যেন ঘাপটি মেরে আছে। অনেকটা যেন তার ফেলে আসা কলেজের সহপাঠীদের মতো। প্রলয়ের সঙ্গে ভাস্বতী দু মিনিট কথা বলেছে কি বলে নি, ওমনি কায়দা করে ভাইকে হটিয়ে তার পাশে বসে পড়ল রণজয় ;—কি ম্যাডাম, ওর সঙ্গে ফিসফিস কেন, আমার সঙ্গেও হোক।

—বলুন কি বলবেন। ভাস্বতীও সঙ্গে সঙ্গে মরালীর মত গ্রীবা তুলেছে।

—আগে শুনি ওর সঙ্গে কী কথা হচ্ছিল !

—কি কথা আর ! এমনিই।...এখানকার লোকালিটি নিয়ে...আপনার ভাই তো এদিকটা বেশ ভাল চেনে !

—আরে দূর দূর, ও মহা গুলবাজ। পাটনার ছেলে তো, তাই শো করে ও যেন গোটা বিহার সম্পর্কে অথরিটি। আপনি আমায় জিজ্ঞেস করুন, আমি আপনাকে এ অঞ্চলের দু হাজার বছরের ইতিহাস বলে দেব।

তখন চাকরি করতে করতে কস্টিং পড়ছে রণজয়। বিক্রমাদিত্য মৌর্য বংশের রাজা, না গুপ্ত বংশের, কাকে বিহার বলে, কাকেই বা সঙ্ঘারাম, কিভাবে ও অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্ম, জৈন ধর্ম বিস্তার লাভ করেছিল, সব কিছুতেই সে সমান অজ্ঞ ! দু মিনিট কথা বলতেই ধরা পড়ে গেল ভাস্বতীর কাছে। তাতেও লজ্জাশরমের বালাই নেই, মুচকি মুচকি হাসছে। শুধু প্রলয়কে ভাস্বতীর সঙ্গে কথা বলতে দেবে না বলেই...

ভাস্বতীর কি সেদিনই রণজয়কে চিনে ফেলা উচিত ছিল ? বোঝা উচিত ছিল রণজয় নিছক ছেলেমানুষ নয়, সে এক আদ্যন্ত ঈর্ষাকাতর পুরুষ ! প্রবল অধিকারমত্ত এক আদিম মানব !

কিন্তু ভাস্বতী বুঝবেই বা কি করে ? তার তো তখন রণজয়কে নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা ছিল না। যে পুরুষ তাকে টানছে না তার হাস্যকর আচরণে মজা লাগতে পারে, তার মনের গভীরে ঢোকার ভাস্বতীর কি দায় ! কে তখন জানত ওই যুবকই একদিন তার নিয়তি হবে ! বুবলু মুনিয়ার বাবা হয়ে ছারখার করে দেবে জীবনটা

রাজগীর পৌঁছে রণজয়রা আলাদা হয়ে গেল। কলকাতা থেকেই ভাস্বতীদের হোটেল বুক করা ছিল, সেখানেই উঠেছে তারা। একদিন নালন্দা পাওয়াপুরী বেড়িয়ে এল, রোজ উষ্ণকুণ্ডে স্নান করছেন হিমানী, বাবা মেয়ে সকালসন্ধ্যে হেঁটে হেঁটে টহল দিচ্ছে রাজগীর, দিন চার পাঁচ দুই মক্কেলের আর টিকিটি নেই।

হিমানী তো একদিন জিজ্ঞাসাই করে ফেললেন,--হ্যাঁরে, বুলু, ছেলেদুটো কোথায় উবে গেল বল্ তো?

ভাস্বতী ভুরু কুঁচকেছিল, --কেন, তাদের দিয়ে তোমার কি দরকার?

--না, এইটুকু তো জায়গা...পথেঘাটে কোথ্থাও দেখা যায় না...ওরা আটি দশ দিন থাকবে বলেছিল না?

--বলেছিল। হয়তো মন টেঁকে নি, চলে গেছে।

ইশ্, সত্যিই যদি তাই হত! অন্ধকারে অস্থির ভাবে মাথা ঝাঁকাল ভাস্বতী। হয়তো তাহলে জীবনটা অন্যরকম হত! হয়তো অন্য কোন পুরুষের সঙ্গে বিয়ে হত তার, আরেক খাতে গড়িয়ে যেন জীবন! সেই জীবন কি এর থেকেও বিশ্রী হত কিছু!

গলাটা শুকিয়ে গেছে। হাত বাড়িয়ে মশারির চালে ফেলা বেডসুইচ টিপতে গিয়ে বাহুমূলে টান অনুভব করল ভাস্বতী। মুনিয়া। মাকে আঁকড়ে ধরে আছে। সন্তর্পণে ভাস্বতী ছাড়াল মেয়ের হাত। আলো জ্বালল। মা দিদিমার মাঝখানে ঠাসাঠাসি করে শুয়ে আছে মেয়ে, পাখার তলাতেও ঘামছে। ভাস্বতী আঁচল দিয়ে মেয়ের কপালটা আলগা মুছে দিল। অল্প কেঁপে উঠল মুনিয়া, ঘুমের ঘোরেই হাত বাড়িয়ে খুঁজছে মাকে। ও বাড়িতে ভাইবোন আলাদা ঘরে শোয়, তখনও কি এভাবে মুনিষা খোঁজে ভাস্বতীকে? নাকি নিরাশ্রয় হওয়ার চোরা আতঙ্কে এমনটা করছে আজ?

ঘুমন্ত মেয়ের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে ভাস্বতী। পালক পালক চোখের পাতা তিরতির নড়ছে। টোপা টোপা গাল, ডলপুতুলের মতো টুলটুলে মুখ কী নিষ্পাপ!

ভাস্বতীর বুক মায়ায় ভরে গেল। এই ফুলকেও কিনা রণজয...!

হিমানী জেগে গেছেন, --কিরে, বসে আছিস যে?

ভাস্বতী সচকিত হল,--জল খাব।

--মন খারাপ লাগছে?

উত্তর দিল না ভাস্বতী। মশারি তুলে বেরিয়ে এল। কোণে টুলে জগ রাখা আছে, ঢকঢক ঢালল গলায়। বেশ খানিকটা জল উপচে গেল মুখ থেকে, গড়িয়ে নামছে গলা বেয়ে। আবার ফিরেছে বিছানায়। আলো নেবাতে গিয়ে

হঠাৎ চোখে পড়ল আবার হাত কাঁপতে শুরু করেছে হিমানীর। ঘুমোলে কাঁপুনি একেবারে থেমে যায়, জেগে উঠলেই শুরু হয়, কী বিচিত্র যে এই রোগ!

মৃদু স্বরে ভাস্বতী জিজ্ঞাসা করল,—তুমি ঠিক মতো ওষুধ খাচ্ছ মা?

—খাই তো।

—তবু দিন দিন এত বাড়ছে কেন? ডাক্তার কি বলছে?

হিমানী চোখ বুজলেন,—এ রোগ আমার আর সারবে না রে বুলু।

—কে বলেছে সারবে না? কত বড় বড় স্পেশালিস্ট দেখাচ্ছে দাদা...কত নতুন নতুন বিদেশী ওষুধ বেরোচ্ছে...

—না রে। প্রবীণ ঠোঁটে শীর্ণ হাসি, —তেমন রোগে ধরলে কারুর আর শারানোর সাধ্য থাকে না। হোমিওপ্যাথি কবিরাজি অ্যালোপ্যাথি কিছু কি কম হল? কোন উন্নতি দেখেছিস? বাড়ছে তো বাড়ছেই।

ভাস্বতী কথা না বাড়িয়ে আলো নিবিয়ে দিল। সত্যিই তো, তেমন তেমন রোগে ধরলে তার থেকে সেরে ওঠা বড় কঠিন। শরীরেরও, মনেরও। এক সময়ে এই মা কত শক্ত সমর্থ ছিল। পাড়ার দুর্গাপুজো কালীপুজোয় ফল কাটা থেকে শুরু করে ভোগ রান্না সবেতেই মায়ের ডাক, আত্মীয় স্বজনদের বাড়ির কাজেকর্মে সাত হাতে খাটছে মা। বাবা তো সেই আটটার মধ্যে অফিস বেরিয়ে যেত, তাসের আড্ডা সেরে ফিরত রাত নটায়, সংসারটাকে একা মাথায় তুলে রেখেছিল মা। অথচ তার মধ্যেই কিনা লুকিয়ে ছিল এই অক্ষম করে দেওয়া রোগের বীজ! ব্যাধি যখন ফুটে বেরোয় তখন মানুষের সেই আগের রূপ যেন সম্পূর্ণ অচেনা হয়ে যায়।

ভাস্বতীরও কি রণজয়ের আগের রূপটাকে কম অজানা লাগে!

কালো আঁধারে আবার ভেসে উঠছে ছবি। বাবার সঙ্গে সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে রাজগীরের পাহাড়ে উঠছে ভাস্বতী। তিন পোয়া পথ পার হয়ে হঠাৎ সিঁড়িতে ধপ করে বসে পড়লেন রমানাথ। নিশ্বাস নিতে পারছেন না, হৃৎপিণ্ডের যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যাচ্ছে মুখ, ঘামছেন দরদর। হিমানীর মুখ ভয়ে কালো, ভাস্বতী কি করবে দিশা পাচ্ছে না। তখনই পাহাড় ফুঁড়ে দেবদূতের মতো আবির্ভূত হল রণজয়। কী পরিশ্রম করে যে বাবাকে নামাল নীচে! ধরাধরি করে তাঁকে টাঙায় তুলে দিল, হোটেলে এসে ডাক্তার ডেকে আনল...! প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা হয়ে যেতে তেমন গুরুতর কিছু ঘটল না বাবার। সকাল বিকেল বাবার খবর নিয়ে গেল রণজয়, বুদ্ধগয়া বাতিল করে তাদের সঙ্গে ফিরে এল কলকাতায়।

প্রায় অপরিচিত রমানাথের জন্য উদ্বিগ্ন সেই রণজয় পরশু রাতে বুবলুর জ্বর শুনেও ডাক্তারের কাছে না গিয়ে বোতল খুলে বসে গেল! মেলা ফ্যাচর ফ্যাচর কোরো না, তোমার ছেলে তুমি সামলাও!

আরও কত বদল। কী পিপাসিত চোখে ভাস্বতীর অফিসের সামনে এসে অপেক্ষা করত রণজয় ! তখন ভাস্বতীর নতুন চাকরি, রণজয়কে দেখে লজ্জায় মরে যেত। কী আকুল মুখে ভাস্বতীর কাছে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল রণজয় ! বিয়ের মুখে মুখে রণজয়ের মা বউদিরা হঠাৎ একটার পর একটা বায়নাক্কা শুরু করল। সাঁইত্রিশখানা নমস্কারী চাই। বরযাত্রীদের প্রাইভেট কারে করে আনতে হবে, লাক্সারি বাস টাস চলবে না। দাদা শুনে রেগে কাঁই। রণজয়কে ডেকে বলেছিল, এমন করলে তো আর তোমাদের সঙ্গে কাজ এগোন যাবে না। বুলুও এমন শ্বশুরবাড়ি পছন্দ করছে না। ভাস্বতীকে হারাতে হতে পারে, শুধু এই সম্ভাবনাতেই ভেঙে পড়েছিল রণজয়। বাড়ি গিয়ে মা বউদিদের সঙ্গে ঝগড়া করেছিল।

সেই রণজয় আজ ভোরে ভাস্বতী বেরিয়ে আসার সময়ে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল। এত জোরে যে আশপাশের ফ্ল্যাটগুলোও বোধহয় কেঁপে উঠেছিল।

না বদল নয়, এটাই বুঝি রণজয়ের আসল রূপ। অন্য চেহারাটা ছিল রণজয়ের ভান।

ভাস্বতী চোখ বুজল। ঘুম আসছে না। শরীরে একটা অসহ্য জ্বালা জ্বালা ভাব, মাথার পিছনটা দপ দপ করছে। উঠে গিয়ে একটু মাথায় জল দিয়ে আসবে ? থাক, মা জেগে আছে, আবার এক রাশ কৈফিয়ত দিতে হবে।

পাশ ফিরল ভাস্বতী। সহসা প্রায় ভুলে যাওয়া এক তেতো ছবি হানা দিয়েছে মস্তিস্কে।...প্রথম বিবাহবার্ষিকীতে দিঘা গেছে দুজনে। শ্রাবণের সমুদ্র সেদিন বড় উত্তাল, অনর্গল ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে পাড়ে। কোমর জলে দাঁড়িয়ে আছে ভাস্বতী, দু হাত দূরে কায়দা করে সিগারেট টানছে রণজয়। হাত নেড়ে ভাস্বতী ডাকল রণজয়কে। হাসছে রণজয়, এগোচ্ছে না, জলকে তার বড় ভয়। হঠাৎ এক প্রকাণ্ড ঢেউ আনমনা ভাস্বতীর ওপর আক্রমণ হেনেছে। উল্টেপাল্টে পড়ে যাচ্ছিল ভাস্বতী, পাশ থেকে এক মধ্যবয়স্ক মানুষ ঘাবড়ে যাওয়া ভাস্বতীর কাঁধ চেপে ধরলেন, কোনক্রমে সামলে গেল ভাস্বতী। ভদ্রলোক পাড়ে এসে কথা বলছেন ভাস্বতীর সঙ্গে। এমনি কথা। কোথ্থেকে এসেছে ভাস্বতীরা, কোথায় উঠেছে, ভবানীপুরে ঠিক কোন্ জায়গায় তাদের বাড়ি, এই সব। ভদ্রলোক ডাব কিনেছেন, ভাস্বতীর দিকে এগিয়ে দিলেন, আবার নেমে গেছেন জলে। এপাশ ওপাশ তাকাল ভাস্বতী, রণজয় নেই। দ্রুত হোটেলে ফিরে দেখল এর মধ্যেই স্নান সেরে রণজয় বিছানায় শুয়ে আছে টানটান।

অবাক মুখে ভাস্বতী জিজ্ঞাসা করল, –আমায় একা ফেলে চলে এলে যে ?

রণজয়ের মুখ থমথম,—একা কোথায়? তোমার তো ওখানে দোকা ছিলই।



ভাস্বতী খিলখিল হেসে উঠল,—হিংসে হয়েছে? ভদ্রলোক সত্যিই খুব ভাল গো। ব্যাচিলর মানুষ...খুব রসিক...

—থামবে তুমি? রণজয় চকিতে রুক্ষ,—অন্য পুরুষের ছোঁয়া বুঝি বেশি মিঠে লাগে?

ভাস্বতীর মুখ নীল হয়ে গেল। দু চার পাশ স্থির দাঁড়িয়ে থেকে ঢুকে গেল বাথরুমে। স্নান সেরে চুপ করে বসে আছে হোটেলের বারান্দায়।

রণজয় পাশে এসে দাঁড়াল,—সরি স্বাতী, তোমার তখন ওভাবে কথা বলা উচিত হয় নি। হঠাৎ মাথাটা এমন গরম হয়ে গেল!

সেই শুরু।

সেদিন প্রথম নেকড়ে বাঘটা উঁকি দিয়েছিল। ক্ষণিকের জন্য থাবা দাঁত নখ দেখিয়ে লুকিয়ে পড়ল গোপন ডেরায়।

ক্রোধটা ফিরে আসছে। দাঁতে দাঁত চাপল ভাস্বতী। এবার রণজয়ের ওই নখ ওই থাবা চিরকালের মতো উপড়ে ফেলতে হবে ভাস্বতী দেখবে রণজয়ের কত তেজ।

॥ তিন ॥

সাত দিনে খবরটা রাষ্ট্র হয়ে গেল অফিসে।

টিফিনে শিখা এসে ধরল--হ্যাঁ রে, তুই নাকি আজকাল পাইকপাড়া থেকে অফিস করছিস ?

ভাস্বতী মুড়ি খাচ্ছিল। তেলমাখা মুড়ি, ঝাল ঝাল, বাদাম নারকেল ছড়ানো। অফিস যাওয়ার আগে কোনও কালেই বেশি খেতে পারে না ভাস্বতী, দুপুর বারোটা থেকেই পেট জ্বালা করে। বউদি টিফিন দিতে চায়, নেয় না ভাস্বতী, অস্বস্তি হয়। এ তো এখন একদিন দু'দিনের ব্যাপার নয়, বারো মাসই চলবে, ক'দিন আর হাতের গোড়ায় টিফিন গুছিয়ে দেবে বউদি ! একদিন না একদিন বিরক্ত হয়ে যাবে না ? নিজেও করে নেওয়া যায়, কিন্তু অন্যের রান্নাঘরে নিজের জন্য ঢুকতে ইচ্ছে করে না। মা সক্ষম থাকলেও একটা কথা ছিল,স্বচ্ছন্দে মার কাছে আবদার করা চলে। ছেলে মেয়ে দুটোকে সারাদিন দেখছে বউদি, এই না ঢের।

এসব ছড়ানো ছোটানো ভাবনার মাঝে শিখার প্রশ্নের গুরুত্বটা ঠিক বুঝল না ভাস্বতী। স্বাভাবিক ভাবেই ঘাড় নেড়ে বলল—হুঁ, বাপের বাড়িতে আছি।

—হঠাৎ অসময়ে সেখানে ?

--বারে, ছেলেমেয়ের পরীক্ষা হয়ে গেছে না ? স্কুল বন্ধ, তাই ক'টা দিন...ওদেরও মামার বাড়ি গিয়ে থাকা হয় না...

- ঠিক বলছিস ? বরের সঙ্গে ঝগড়া করে চলে যাসনি তো ?

ভাস্বতীর স্নায়ু সজাগ হল। তাদের এই ছোট্ট আধা সরকারি অফিসে সাকুল্যে জনা চল্লিশেক লোক। সাত আটটা মেয়ে, বাকি পুরুষ। মহিলা কর্মীদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে সব পুরুষেরই অসীম কৌতূহল। অকারণ। অবশ্য মেয়েরাও পরচর্চায় পিছিয়ে নেই। এমতাবস্থায় একটা বেফাঁস কথা কী ভাবে পল্লবিত হবে তার নিশ্চয়তা আছে ! শিখা তার পুরনো ঘনিষ্ঠ বন্ধু, অনেক মনপ্রাণের কথা হয় দুজনের, কিন্তু আজ এই মুহূর্তে বুঝি মুখে কুলুপ এঁটে রাখাই ভাল।

সতর্ক স্বরে ভাস্বতী বলল -দূর, ঝগড়া হবে কেন ?

—না...দীপ্তি অসীমা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিল, কানে গেল, তাই তোকে...

—কী বলছিল ওরা ?

—তাহলে ঝগড়া সত্যি হয়েছে ? শিখা চোখ সরু করল।

সামনে খোলা টাইপ মেশিনে মুখ নামাল ভাস্বতী—বরের সঙ্গে ঝগড়া হলেই বুঝি শুধু মেয়েরা বাপের বাড়ি যায় ? ক্রিসমাসের সময়ে আমি পাইকপাড়া গিয়ে থাকিনি ?

শিখা কী বুঝল কে জানে, উঠে দাঁড়িয়ে গোয়েন্দা চোখে ভাস্বতীকে দেখতে দেখতে বলল—তাহলে বোধহয় ওরা ভুল শুনেছে।

ভাস্বতী কথা বাড়াল না। ভাবছিল, কোথ্থেকে রটল কথাটা ! অফিসের কেউই তার বাড়ির কাছাকাছি থাকে না। থাকলেই বা কী ঘন্টা হত ? রাতে ঝগড়া হয়েছে, সকালে বেরিয়ে গেছে, লোকে টেরই বা পাবে কী করে ? অফিস-পিওন মধু টালা পার্কের দিকে থাকে, দু'তিন দিন তার সঙ্গে দেখাও হয়েছে কিন্তু সেই বা কী করে বুঝবে ভাস্বতী চিরকালের মতো চলে এসেছে।

সূত্রটা খুঁজে পেতে সময় লাগল না।

ছুটির আগে টয়লেটে অসীমার সামনে পড়ে গেল ভাস্বতী। অসীমার সঙ্গে ভাস্বতীর তেমন খাতির নেই, দেখা হলে কুশল বিনিময় হয়, ব্যস্। ভাস্বতী বিশেষ পছন্দও করে না অসীমাকে। বড় বেশি বাচাল টাইপ, সিনিয়ারদের সম্মান দিয়ে কথা বলে না।

অসীমাই গায়ে পড়ে কথা শুরু করল—তোমার বরের সঙ্গে তোমার কী হয়েছে গো ভাস্বতীদি ?

—কীসের কী !

—লুকোচ্ছ কেন গো ? সব জানি। অসীমার ঠোঁটে ফিচেল হাসি,—তোমার বরের সঙ্গে কাল দেখা হয়েছিল। অফিস থেকে কাল একটু বেরোতে দেরি হল,বাসে উঠতে যাচ্ছি...তোমার বর ডাকল।

ভাস্বতীর ভুরু কুঁচকে গেল। শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার মুখ নেই, অফিসের সামনে এসে দাঁড়িয়ে আছে !

অসীমার হাসি বড় হল—জিজ্ঞেস করছিল তুমি অফিসে রোজ আসছ কি না, কখন এসেছ, কখন বেরিয়েছ...। খুব ভেঙে পড়েছে মনে হল। আহা, কেন এত যাঁতা দিলে গো ?

ভেঙে পড়েছে রণজয় ! অভিনয় অভিনয়, ভাস্বতী সব বোঝে।

উত্তর না দিয়ে চলে আসছিল ভাস্বতী, পিছন থেকে অসীমা বলল—রাহুল বলে ছেলেটাকে নিয়েই বুঝি গণ্ডগোল, ভাস্বতীদি ?

সপাং চাবুক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল ভাস্বতী।

অমনি অসীমা গলা নামিয়েছে—আমি কী করে জানব ! তোমার বরের জেরা শুনে মনে হল। জানতে চাইছিল রাহুল তোমার কাছে আসে কি না, এলে কখন আসে, কতক্ষণ থাকে...

অসীমা কথা শেষ করল না। তবু যেন ফুরোল না কথাটা। ঘুরতেই থাকল ঘুরতেই থাকল, ঘুরে ঘুরে কানে বাজছে ভাস্বতীর। ঝাঁ ঝাঁ করছে কান, যেন লক্ষ ঝিঁঝিঁ পোকা কলরোল তুলছে অফিস জুড়ে।

সিটে এসে খানিকক্ষণ ঝুম্ বসে রইল ভাস্বতী। ঘরে অপমান করে সুখ হয়নি, এখন অফিসে হানা দিচ্ছে রণজয় ! আরও ছোট করতে চায় ভাস্বতীকে ! রাহুল এখানে নেই, নাটকের দলের সঙ্গে শিলিগুড়ি গেছে, ফিরে যদি এসব কথা শোনে, কী ভাববে ছেলেটা !

রাহুলের সঙ্গে ভাস্বতীর হৃদ্যতা বছর দুয়েকের। হঠাৎ একদিন অফিসের সামনে দেখা। ভাস্বতী চিনতেও পারেনি। কলেজের বান্ধবীর ভাই, সেই কবে ছোটটি দেখেছিল, মনে রাখা সম্ভব ! রাহুল নিজেই যেচে পরিচয় দিল। তখন সবে চাকরি পেয়েছে রাহুল, ভাস্বতীদেরই বিল্ডিংয়ে, ইনসিওরেন্সে। লম্বা চোখা চেহারার প্রাণবন্ত ছেলে, ঝাঁকড়া দাড়ি, ঝাঁকড়া চুল, ফুটফুট খই ফুটছে মুখে। ...দিদির খবর জানো তো ? বরুণদার সঙ্গে অফ্রিকার জঙ্গলে চলে গেছে। ...না না, ওয়াইল্ড লাইফ রিসার্চ নয় গো, বরুণদা সিএ সিএস। নাইরোবিতে জব ভাউচার পেয়েছে ঘ্যামচ্যাক। ...তুমি এখন কোথায় আছ গো ভাস্বতীদি ?... আইব্বাস যাদবপুর ! আমি তো ওদিকে প্রায়ই যাই। সেন্ট্রাল পার্কের একটা বাড়িতে আমাদের রিহার্সাল্ হয়। ...এই ভাস্বতীদি, ধোসা খাবে ? পেট্রোল পাম্পের পাশের দোকানটায় দুর্দান্ত ধোসা করে। ...পেমেন্ট কিন্তু আমি করব। বড় বলে রঙ নেবে না।

পরের শনিবারই বাড়ি খুঁজে হাজির রাহুল। প্রবল বর্ষায়। কাকভেজা হয়ে। তোয়ালে দিয়ে ঘষে ঘষে মুখ মাথা মুছতে মুছতে পুরো জটাধারী সন্ন্যাসী হয়ে গেল। লজ্জাশরমের বালাই নেই, রান্নাঘরে ঢুকে হাঁড়ি পাখলে পাখলে খিচুড়ি খেল ভরপেট। গলা ছেড়ে গান গাইল। সেই দিন থেকেই বুবল্ মুনিয়া রাহুলমামার ফ্যান। যখনই আসে ভাগ্নে ভাগ্নির জন্য খেলনা কমিকস চকোলেট। হাহা হাসছে, নাটকের ডায়ালগ শোনাচ্ছে, মূকাভিনয় করছে।

বিটকেল বিটকেল সব ধাঁধা শেখাচ্ছে বুবলুকে, মুনিয়াকে নিয়ে চলছে অনন্ত লোফালুফি। কে বলবে রাহুল বুবলু মুনিয়ার আপন মামা নয়!

রণজয়ের সঙ্গেও প্রথম প্রথম পটেছিল খুব। ছুটির দিনে সাতসকালে রাহুল হাজির,--ভাস্বতীদি, আজকের মতো বডি ফেলে দিলাম। রণোদা কোথায় ?

বলতে না বলতেই রণজয়ের গলা শোনা যেত,--এসে গেছ ? গুড। ভাবছিলাম সারা দিন কি ভাবে কাটাব।...হোক তাহলে।

--হোক।

ব্যস্, ওমনি দাবার বোর্ড বেরিয়ে গেল। গজ-ঘোড়া বোড়ে মন্ত্রী নৌকো সজ্জিত হচ্ছে যুদ্ধের সাজে। পাশে বুবলু মুনিয়া উৎসাহী দর্শক। খেলা আবার এমনি এমনি হবে না, কিছু না কিছু বাজি ধরা চাই। হারলে তুমি চিকেন পকোড়া খাওয়াবে, রাহুল। আপনি হারলে কিন্তু আইসক্রিম খাওয়াতে হবে রণোদা। বাজির খাওয়া তো পরের ব্যাপার, খেলতে খেলতেই হুকুম চলছে, গরম গরম আলুর চপ ভেজে দাও না স্বাতী। শুধু চপ নয় ভাস্বতীদি, সঙ্গে চা'ও চাই। রান্নাঘর থেকে পরের পর খাদ্য আর পানীয় সরবরাহ চলছে। কাজকর্ম শিকেয় উঠে গেল, দুপুরে নাওয়া খাওয়ার নামটি নেই, চৌষট্টি ঘরে চোখ গেঁথে বসে আছে দুই মহারথী।

তার মধ্যেই চিৎকার শোনা যায় ঘন ঘন।--

--অ্যাই, তুমি চাল ফেরত নিলে কেন ?

--কোথায় চাল ফেরত নিলাম রণোদা ? আমি তো নৌকো মুভ করি নি।

--টাচ তো করেছ। টাচ মানেই মুভ। তোমাকে ওই নৌকোটাই চালতে হবে।

--বারে, আপনি যে তখন বিশপ হাতে তুলে নামিয়ে রেখে ঘোড়া এগোলেন!

--সে পাস্ট ইজ পাস্ট। তুমি আপত্তি করো নি কেন ?

--এটা কিন্তু চোট্টামি হচ্ছে রণোদা। নিয়ম দুজনের জন্য একই হওয়া উচিত।

--ঠিক আছে, ঠিক আছে। রণজয় হঠাৎ উদার। বোধহয় বোর্ডে সৈন্যসামন্তের অবস্থা দেখেই--বাট দিজ ইজ লাস্ট টাইম রাহুল।...তবে ও চাল ফেরত নিয়েও তুমি জিততে পারবে না।

দেখা যাক।

আবার দুই যুযুধান প্রতিপক্ষের লড়াই শুরু। ক্ষণ পরেই রাহুলের অট্টহাসি.

নয়তো রণজয়ের হেঁড়ে গলা। ভাস্বতীদি ভাস্বতীদি, রণোদা মাৎ। দেখে যাও স্বাতী, তোমার ভাইকে কেমন পেড়ে ফেলেছি! অ্যাই, টাকা ফ্যালো, টাকা ফ্যালো।

দুজনের গলাতেই হাল্‌কা মজা, দুজনের কথাতেই সহজ বন্ধুত্বের সুর। ভাস্বতীর ফ্ল্যাট কী আলো বাতাসেই না তখন ভরে থাকত দিনভর! হঠাৎ কোন সকালে এসে ধুয়ো তুলল রাহুল, খাবার দাবার প্যাক করে বুবলু মুনিয়া সহ নাচতে নাচতে বেরিয়ে পড়েছে রণজয় আর ভাস্বতী। চিড়িয়াখানা। নিকো পার্ক। বোটানিকাল গার্ডেন। গঙ্গাবক্ষে বেসুরে গান ধরেছে রণজয়, নৌকোর খোলা পাটানতে বসে ধাঁই ধপাধপ সঙ্গত করছে রাহুল। তালি দিচ্ছে বুবলু মুনিয়াও, রণজয়ের সঙ্গে গলা মেলানোর বৃথা চেষ্টা করে চলেছে ভাস্বতী। ঘুরন্ত নাগরদোলায় রণজয়ের হাত চেপে ধরেছে নার্ভাস রাহুল, তার সন্ত্রস্ত মুখ দেখে হাসিতে লুটিয়ে পড়ছে ভাস্বতী। পাঁচ জনে মিলে যেন এক উচ্ছল রঙিন কোরাস্।

কদিনই বা টিকল ছবিটা! এক বছর? দেড় বছর? কী দ্রুত পাল্টাতে শুরু করল দৃশ্যপট! ক্রূর সন্দেহপ্রবণ এক রণজয় ভেসে উঠল ক্রমশ। সন্দেহের স্বভাব তো রণজয়ের ছিলই, চিরকাল ছিল। দীঘায় একদিনের ক্ষণিক বিস্ফোরণ ভাস্বতী তো ভুলে যেতে চেয়েছিল, রণজয় তাকে ভুলতে দিল কই! মাঝে কটা বছর একটু সহ্যের মধ্যে ছিল, এই যা। সন্দেহের বশে কী না করেছে রণজয়। নতুন ফ্ল্যাটে উঠে আসার পর ছোটখাটো একটা আড্ডা জমেছিল বাড়িতে রণজয়ের বন্ধুদের। তাস দাবা চলত, গল্পগুজব হত, মদ্যপানের আসরও বসত মাঝে মাঝে। এসব আড্ডায় যা হয়, দু চার জনের বেশ মুখ আলগা ছিল, ছুটছাট আদিরসাত্মক রসিকতা করত ভাস্বতীর সঙ্গে। ঠোঁটে একটু ভাল করে ক্রিম ঘষো ভাস্বতী, অমন তুলতুলে ঠোঁট দুটো শালা রণজয়টা যে ক্ষইয়ে দিল!...হেঁ হেঁ, আমার গালে তো আর ঠোঁট ছোঁওয়াবে না, দাও, এই তাসটাতেই....! কিম্বা হয়তো চায়ে চিনি লাগবে না ভাস্বতী, তোমার আঙুলটা ডুবিয়ে দিও তাহলেই হবে। দিব্যেন্দু নামের বন্ধুটা কেমন চাষাড়ে টাইপ ছিল! দু পেগ পেটে পড়লেই ভাস্বতীকে গিন্নি গিন্নি বলে ডাকা শুরু করত। সবই নিছক ঠাট্টা, তাতেই ভয়ানক রেগে যেত রণজয়। তার ধারণা এ সমস্তই পরকীয়ার পূর্বাভাস। কায়দা কানুন করে নিজেই রণজয় আড্ডাটা ভেঙে দিল। শুধু কি তাই! কৃচিৎ কখনো সামাজিক অনুষ্ঠান ছাড়া বন্ধুবান্ধবের বাড়ি যাতায়াত বন্ধ হয়ে গেল। নিজে যেখানে খুশি যাবে, যখন খুশি ফিরবে, কিন্তু অফিস থেকে ঠিক সময়ে ফিরে বাড়িতে থাকতে হবে। এটাই রণজয়ের আইন।

তাও যথাসম্ভব মেনে নিয়েছে ভাস্বতী। সংসার করতে গেলে মেয়েদের অনেকটাই ছাড়তে হয়। তবু কি নিস্তার আছে? বছরে এক দিন অফিসের পিকনিক, গেছে ভাস্বতী, রণজয় তিন দিন গুম। জ্বরে কোঁ কোঁ করছে ভাস্বতী, অফিসের কোন পুরুষ কলিগ দেখতে এল, ওমনি জেরা শুরু। কেন এল! অতক্ষণ ধরে কি গুজগুজ করছিল! অসুস্থ লোককে দেখতে এসে অত হাসে কেন!

এমন সংশয়ী মানুষ কদিন মুখোশ পরে থাকবে! কদিন হজম করবে রাহুলকে! অফিস থেকে রাহুলের নাটক দেখতে গেছে ভাস্বতী, ফিরতে বোধহয় সাড়ে নটা বেজেছে, বাড়িতে দাপাচ্ছে রণজয়। রাহুলের সামনে ভালমানুষটি, কিন্তু আড়ালে আড়ালে বক্র হচ্ছে ভাষা। ভেবেছটা কি, অ্যাঁ? ছেলে মেয়ে সংসার ফেলে ওই ছোকরার পেছনে অত ল্যাল্ ল্যাল্ করে ছুটে বেড়াচ্ছ কেন? পুজোর সময়ে শাড়ি দিল রাহুল, অতি সাধারণ শাড়ি, সিন্থেটিক। কেন দিল! কোন্ সুবাদে দিল! হাহ্, ভাই! সারাক্ষণ ঢলাঢলি করছ দুজনে, আবার ভাই মারাচ্ছ! তর্ক করবে না, তর্ক করবে না, চড়িয়ে দাঁত ফেলে দেব। ছেলেমেয়ের সামনে এই অপমান কাঁহাতক বরদাস্ত করা যায়! অন্যায় শাসনই বা কেন শুনবে ভাস্বতী!

শেষ দিনের লড়াইটাও রাহুলকে নিয়ে। কেন মুনিয়াকে অত দামি ডান্সিং ফ্রক কিনে দিয়ে গেল রাহুল! সব জানি আমি, সব টের পাই। রাহুলের সঙ্গে সম্পর্ক তোমার দু'বছরের! মিথ্যে কথা। লাই লাই, ড্যাম লাই। পুরনো আশনাই ঘরে ঢোকানোর জন্য ভাইবোনের কামোফ্লেজ দেওয়া! আমাকে এত বোকা ভাবো! আমার রং কালো, তোমার রং কালো, মুনিয়া কী করে এত ফর্সা হল! তোমার রাহুলের মতো!

এ কথাও বলেছে রণজয়।

রাগেই বলুক, হিংসেতেই বলুক, কী নেশাতে, বলেছে তো।

একি শুধু সন্দেহ? মনের কোণে সূক্ষ্ম একটা অবিশ্বাস ঘাঁটি গেড়ে না বসলে কোন স্বামী এ কথা উচ্চারণ করতে পারে?

এর পরও আর কত অসম্মান করতে চায় রণজয়!

।। চার ।।

পাঁচ সাত দিন কেটে গেল।

রণজয় আর অফিসের ত্রিসীমানায় আসেনি।

অথচ ভাস্বতী আশঙ্কা করেছিল আসবে রণজয়। ছুটির পর সঙ্গে সঙ্গে বাসে ওঠেনি, অপেক্ষা করেছে খানিকক্ষণ, চোখ চালিয়ে খুঁজেছে তন্ন তন্ন করে। নেই। সেই একদিনই ধোঁয়ার মতো আবির্ভূত হয়ে তার অফিসের হাওয়া দূষিত করেই উধাও রণজয়। নিশ্চুপ। কী মতলব ভাঁজছে কে জানে! পাইকপাড়ার বাড়িতে একবারও যোগাযোগ করল না, একটা ফোন পর্যন্ত না। আশ্চর্য! ভাস্বতীর খবর না নিক, বুবলু মুনিয়ার তো খোঁজ নিতে পারত। ছেলে মেয়ের রেজাল্ট বেরিয়ে গেল, থ্রিতে উঠল বুবলু, মুনিয়া নার্সারি টু, তাদের সম্পর্কেও কোনও আগ্রহ নেই রণজয়ের! এদিকে ও বাড়ির চেহারা ভার হচ্ছে ক্রমশ। বিশেষত মার। রোজই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জামাইয়ের কথা তোলে মা, উল্টো দিক থেকে সাড়া না পেয়ে মুখ আরও কালো। বুবলু মুনিয়াও কেমন মনমরা হয়ে যাচ্ছে, ভাস্বতী টের পায়। হাসে কম, খেলে কম, কথা বলে আরও কম। দাদা বউদির চোখের প্রশ্নচিহ্নও বড় হচ্ছে দিন দিন।

অফিসে এসে আজ মনস্থির করে ফেলল ভাস্বতী। প্রথম রাগের ঝোঁকটা কেটে গেছে, এবার একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। রণজয় যদি সত্যিই এত উদাসীন হয়, তারও আর এই সম্পর্ক বয়ে বেড়ানোর দায় নেই। তবে পাকাপাকি আলাদা থাকতে গেলে তার একটা স্থায়ী প্রস্তুতি নেওয়া দরকার। অফিস থেকে আজ একটু আগে আগে বেরিয়ে সোজা যাদবপুর যাবে। বুবলু মুনিয়ার সোমবার থেকে ক্লাস শুরু হচ্ছে, সেদিন তাড়াহুড়োতে ওদের ইউনিফর্ম আনা হয়নি, আগে সেগুলো নিয়ে আসা প্রয়োজন।

সেই মতোই বেরোচ্ছিল, অফিসের দরজায় রাহুলের সঙ্গে দেখা।

—তাড়াতাড়ি কাটছ যে?

—কাজ আছে। ভাস্বতী আলগা হাসল —তুমি ফিরলে কবে?

—কাল ভোরে। এসেই একটা লম্বা ঘুম দিলাম। টানা আঠোরো ঘণ্টা।

—শো কেমন হল? বলতে বলতে ঘড়ি দেখল ভাস্বতী।

—শিলিগুড়িতে তো গ্র্যান্ড। দারুণ অডিয়েন্স, দারুণ রেসপন্স। পর পর দুটো কল শো হাউস ফুল। কুচবিহারের শো-টা অবশ্য জমেনি। হেভি শাওয়ার। সারাটা দিন। তবু নয় নয় করেও শ' দুয়েক লোক হয়েছিল।

—বাহ্। করিডোর ধরে হাঁটতে শুরু করেছে ভাস্বতী। ঘাড় ঘুরিয়ে একবার অফিসের দিকে দেখে নিল। চোরা একটা অস্বস্তি কিলবিল করছে বুকে। অফিসের কেউ দেখছে কি!

দ্রুত পা চালিয়ে লিফটের সামনে এল ভাস্বতী।

পিছন পিছন রাহুলও —কী ব্যাপার বলো তো? দৌড়চ্ছ কোথায়?

—বললাম তো কাজ আছে।

—কী কাজ?

—তুমি জেনে কী করবে?

রাহুল ফিক করে হাসল —তুমি এত সিক্রেটিভ হয়ে গেলে কবে থেকে?

ভাস্বতী সামান্য চোয়াল ফাঁক করল।

—বুবলু মুনিয়ার কী খবর? ওরা নিশ্চয়ই আমায় খুব মিস করছে?

ভাস্বতীর এবারও কোনও জবাব নেই।

লিফট এসে গেছে, টুক করে ভেতরে সেঁধিয়ে গিয়ে ভাস্বতী বলল—যাচ্ছি। পরে কথা হবে।

তাতেও রক্ষা নেই। লাফাতে লাফাতে পাঁচতলা থেকে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসেছে রাহুল। বিল্ডিংয়ের গেটে পৌঁছনোর আগে ধরে ফেলেছে ভাস্বতীকে। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল— তোমার ব্যাপারটা কী বলো তো? অ্যাদ্দিন পর এলাম...আমাকে কাটিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছ?

—কতবার তো বললাম। কাজ আছে।

—বাপস রে, এত ফায়ার কেন? তোমাদের ওই ট্যারা বসের কাছে ঝাড়টাড় খেয়েছ নাকি?

—ফাজলামি কোরো না। আমার আজ মেজাজ ভাল নেই।

—কেস্টা কি? লুজ মোশান? অম্বল? মাইগ্রেন?

রাহুলের সামনে সত্যিই গোমড়া থাকা কঠিন। ভাস্বতী হেসে ফেলল—কিচ্ছু হয়নি রে বাবা।

—বললেই হল! আমি ফেস রিড করতে পারি। নাকের পাটা ফোলা কেন? মুখে কী বিড়বিড় করছ?

ভাস্বতী আবার মুখে কুলুপ আঁটল। পা চালাচ্ছে জোর জোর।

একটু পিছনে দাঁড়িয়ে গেল রাহুল—কাল তোমাদের বাড়ি আসছি। রাতের দিকে। বুবলু মুনিয়ার জন্য সারপ্রাইজ আছে।

ভাস্বতী মুহূর্তে ইতিকর্তব্য স্থির করে নিল। অনর্থক জটিলতা বাড়িয়ে লাভ নেই, সরাসরি জনিয়ে দেওয়াই ভাল। পিছিয়ে এসে স্তিমিত স্বরে বলল—বুবলু মুনিয়া নেই। পাইকপাড়ায় আছে।

—সেকি ! ওদের স্কুল স্টার্ট হয়নি ?

—সোমবার খুলবে।

—ওরা কি রোববার ফিরছে ? রাহুল মাথা চুলকোল—রবি সোম তো আমার আবার একটু কাজ কাছে, নাটকের একটা ওয়ার্কশপ চলবে...হোলডে...তাহলে কি মঙ্গলবার যাব ?

ভাস্বতী একটা নিশ্বাস টানল—বুবলু মুনিয়া এখন পাইকপাড়া থেকেই স্কুল করবে।

—কেন ?

—করবে। এবার থেকে ওখানেই থাকব আমরা।

রাহুল যেন এতক্ষণে থমকেছে—রণোদা কোথায় ?

—সে তার মতো তার বাড়িতেই আছে।

—তুমি দেখছি আমায় সাসপেন্স দিচ্ছ !

ভাস্বতী আবার চুপ।

নীরবতাই বুঝি সেতু রচনা করে দিল। কিছু কিছু বুঝল রাহুল, কিছু আন্দাজ করল। উচ্ছ্বাস ভরা মুখে পলকা ছায়া, মাথা নিচু, হাঁটছে পাশে পাশে। একটা সিগারেট ধরাল। ক'টা টান দিয়েই ফেলে দিল।

বাস স্টপ অবধি হেঁটে এসে মুখ তুলেছে —এত সব কবে ঘটল ?

—ঘটে গেল।

—আমি যাওয়ার পর পরই ?

—বলতে পারো।

দু'চার সেকেন্ডে নীরব থেকে রাহুল বলল—কারণটা জানতে পারি ?

—পোষাচ্ছিল না।

—হঠাৎ ?

—দুনিয়ায় কিছুই হঠাৎ ঘটে না রাহুল। ভাস্বতী বহুক্ষণ পর রাহুলের দিকে সোজাসুজি তাকাল—এই যে সামনে বাসটা আসছে, আমি যদি এখন এর তলায় চাপা পড়ি, সেটাও হঠাৎ ঘটবে না। কারণ থাকবে। হয় আমি অন্যমনস্ক ছিলাম নয় ড্রাইভার রেকলেস চালাচ্ছিল। দুটোর কোনওটাই না হলে বুঝতে হবে গাড়িটার কলকব্জা বিগড়েছিল। নেহাত আমরা তলিয়ে দেখি না তাই ভাবি...

রাহুল চোখ সরিয়ে নিল। আনমনা মুখে পথচারীদের দেখছে। আকাশের

কোণে মেঘ জমছে, যখন তখন কালবৈশাখী আসতে পারে। ঢং ঢং ঘণ্টা বাজিয়ে দমকলের গাড়ি ছুটে যাচ্ছে, অন্য গাড়িরা সন্ত্রস্ত হয়ে ছেড়ে দিচ্ছে পথ। বিপদ সংকেত মিলিয়ে গেল ক্রমশ।

রাহুল আপন মনে বলে উঠল—আমি কিছুটা আঁচ করেছিলাম।...রণোদা বড্ড মুডি মানুষ। ...মিটমাট সম্ভব নয়?

—আমি রাজি নই। ভাস্বতী শ্বাস চাপল।

—এত তাড়াতাড়ি ফাইনাল ডিসিশান নিয়ে ফেললে?

এগারো বছর ওই লোকের সঙ্গে ঘর করার পরও রাহুল বলে তাড়াতাড়ি!

ভাস্বতীর ঠোঁট বেঁকে গেল—ডিসিশান ফাইনালই হয় রাহুল। ডিসিশানের কোন মাঝামাঝি অবস্থা নেই।

—হুম। রাহুল বুঝদারের মতো মাথা নাড়ল—তুমি এখন চলেছ কোথায়? পাইকপাড়া ফিরছ?

পলকের জন্য ভাস্বতী ভাবল হ্যাঁ বলে দেয়, মুখ দিয়ে মিথ্যেটা বেরোলই না। বলল —না। আমি এখন যাদবপুর যাচ্ছি। ক'টা জিনিস নেওয়ার আছে।

—ও। আমি কি যাব তোমার সঙ্গে?

ভাস্বতী দ্বিধায় পড়ে গেল। না বলাই যায়, কিন্তু কেন না বলবে? সেটা হবে মনের দুর্বলতা দেখানো। রণজয়ের অভিযোগটাকে প্রশ্রয় দেওয়া। যদিও এই মুহূর্তে একা থাকতেই ইচ্ছে করছে, তবু রাহুলকে সে কথা বলা বড় কঠিন। এত সরল মায়াবী ছেলেটাকে আঘাত দিতে খারাপ লাগে।

ভাস্বতী মৃদু ঘাড় নাড়ল —চলো।

—ট্যাক্সি ধরব?

—ধরতে পারো, কিন্তু ভাড়া আমি দেব।

গোটা পথ প্রায় নিঃশব্দেই কাটল। টুকটাক দু চারটে প্রশ্ন করছিল রাহুল, কী ভাবে স্কুল করবে বুবলু মুনিয়া, ভাস্বতীর বেশি পরিশ্রম হয়ে যাবে কি না, এই সব। হুঁ হাঁ উত্তর দিচ্ছিল ভাস্বতী। কথা জমছিল না। কখন যেন দুজনেরই চোখ জানালার বাইরে।

তিনতলায় ভাস্বতীদের ফ্ল্যাট। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে দাঁড়িয়ে গেল রাহুল— তুমি কী নেবে নিয়ে এসো। আমি নীচে দাঁড়াচ্ছি।

—কেন?

—এমনিই। ...দেরি কোরো না। আমাকে আবার রিহার্সালে যেতে হবে।

—তাহলে তুমি এলে কেন?

রাহুল উত্তরও দিল না, ওপরেও উঠল না। সিঁড়ির ল্যান্ডিংয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাল। ল্যান্ডিংয়ে কাচের জানলা, চোখ রেখেছে জানলায়।

ভাস্বতী আর জোরাজুরি করল না। মানুষের মন বোঝা বড় ভার। কী ভেবে এল, কী ভেবে দাঁড়িয়ে গেল ভগবান জানে। রাহুলকে তো সে বলেনি তাকে সন্দেহ করেই যুদ্ধ করেছে রণজয় ? তবে রাহুল কি আঁচ করেছে কিছু ? নাকি রাহুলের মনেও পাপ আছে কোনও ?

ফ্ল্যাটের লক খুলে অন্দরে ঢুকতেই ভাস্বতীর বুকটা ধক করে উঠেছে। শূন্য ফ্ল্যাট কী ভীষণ শূন্য। কত সময়ে তো খালি ফ্ল্যাটে একা থেকেছে ভাস্বতী, কই কখনও তো এমন অনুভূতি আসেনি ! কখন কাজ করে গেছে সীতার মা ? রণজয় কটায় ফেরে ?

ভাস্বতী সব ঘরের আলো জ্বেলে দিল। রান্নাঘর বাথরুম সব আলোকিত হয়ে গেছে। জ্বলুক জ্বলুক, একটু অন্তত দীপ্তিময় হোক।

উচ্চকিত আলোয় শুনশান ফ্ল্যাটে ঘুরছে ভাস্বতী। এ ঘর ও ঘর সর্বত্র। ড্রয়িংরুমের ক্যাবিনেটে হাত বোলাল। এই ফ্ল্যাটে আসার আগে বানিয়েছিল ক্যাবিনেটটা, নিজের পছন্দে, নিজের ডিজাইনে। কাচের শো-কেসটা নিলামঘর থেকে কেনা। রান্নাঘরের বাসন রাখার র‍্যাকটা এখনও ছ মাসও হয়নি। সোফায় নতুন ঢাকা পরাবে ভেবেছিল, চৈত্র সেলে কেনার জন্য সরানোও ছিল টাকা। বুবলু মুনিয়ার ঘর অল্প অবিন্যস্ত, সেখানেও চোখ বোলাল ভাস্বতী। দেখে মনে হয় এই মাত্র দুটিতে গেছে কোথাও, এখনই ফিরবে। ভাস্বতীদের খাটে জংলা ছাপ বেড কভার পরিপাটি পাতা, কোণের তাকে বালিশ মশারি। যেমনটি রাখে ভাস্বতী। ড্রেসিং টেবিলে এখনও ছড়ানো আছে ভাস্বতীর প্রসাধনী। এলোমেলো। একটার গায়ে একটা।

সবই কেমন অচেনা লাগছে। নিজের জিনিস, নিজের ঘরবাড়িও এমনটি মনে হয় ! হয়তো।

ডাইনিং স্পেসে এসে ফ্রিজটা একবার খুলল ভাস্বতী। ঠান্ডা জলের বোতল, ডিম, মাখন, দুধ। সীতার মা কী যেন একটা রেঁধেও রেখে গেছে। কাঁসির ঢাকা খুলতে গিয়েও খুলল না ভাস্বতী। কী হবে দেখে ! ভাস্বতী ছাড়াই সব তো সুন্দর চলছে। ভাস্বতীকে কার কী প্রয়োজন।

বেডরুমে ফিরে এল ভাস্বতী। আলমারি খুলে, ওপর থেকে কিটস্ ব্যাগ নামিয়ে শাড়ি ভরল কয়েকটা। সেদিন ঝোঁকের মাথায় মাত্র চার পাঁচটা শাড়ি নিয়ে গেছে, কুলোচ্ছে না। রাহুলের দেওয়া সাদাকালো সিন্থেটিকটা নাড়াচাড়া

করে দেখল একটু, পুরলো ব্যাগে। দ্রুত হাতে কয়েকটা সায়া ব্লাউজ ব্রেসিয়ার। লকারে রাখা মোটা বালা দুটো নিল, মফচেন নিয়েও রেখে দিল। রণজয়ের দেওয়া জিনিস রণজয়ের ঘরেই থাক। গত বিবাহবার্ষিকীতে রণজয় নীল কাঞ্জিভরম দিয়েছিল, ওটাও ভাস্বতী ছোঁবে না। পাশের ঘর থেকে বুবলু মুনিয়ার ইউনিফর্মগুলো নিয়ে এল, কয়েকটা জামাকাপড়ও। ঠেসে ঠেসে ভরল ব্যাগে। অনেক কিছু রয়ে গেল। বুবলুর ক্রিকেট ব্যাট, মুনিয়ার এক রাশ পুতুল...। দাদাকে পাঠাবে একদিন ? এতগুলো জিনিস যে নিয়ে যাচ্ছে, চিরকুটে লিখে রেখে যাবে ? কেন লিখবে ? সবই তো নিজের জিনিস। নিজের।

কিটসব্যাগ বন্ধ করতে গিয়ে ভাস্বতীর বুকটা হঠাৎ মুচড়ে উঠল। কেউ যেন হ্যাণ্ড ড্রিল চালাচ্ছে হৃৎপিণ্ডে। কুরছে। রক্তমাংসের অসংখ্য কণা ঠিকরে গেল সাজানো ফ্ল্যাটে। সেদিন যাওয়ার সময়ে রাগ ছিল, আজ কোত্থেকে ঝাঁক ঝাঁক কষ্ট এসে আছাড়ি পিছাড়ি খাচ্ছে। স্বত্ব ছেড়ে যেতে এত হাহাকার ! সংসারে এত মায়া জড়ানো থাকে !

ঘরের মধ্যিখানে বসে ডুকরে কেঁদে উঠল ভাস্বতী।

॥ পাঁচ ॥

—মোট কত হল ?

সাতশো বত্রিশ।

—এত ? ....কমিশান দিলেন না কিছু ?

—দিয়েছি তো দিদি। এই বইগুলোতে টেন পারসেন্ট...এই বইগুলোয় ফিফটিন পারসেন্ট...

ভাস্বতী বিরস মুখে ভ্যানিটি ব্যাগ খুলল। বুবলু মুনিয়ার বইপত্রের দামও বেড়েছে বটে। গত বছর পাঁচশোর মধ্যে হয়ে গিয়েছিল, এবার বাজেট আরও আড়াইশো বেড়ে গেল। এর পর আবার খাতা আছে। অজস্র খাতা, রাশি রাশি খাতা, সেই সব আবার স্কুল ছাড়া অন্য কোথাও থেকে কেনা চলবে না। নাম লেখা বত্রিশ পাতা আটচল্লিশ পাতার খাতাগুলোর কী সব দাম ! ছ টাকা ! আট টাকা ! বুবলু মুনিয়ার মাস মাস মাইনেও বাড়ল পঞ্চাশ টাকা করে। খরচা শুধু বাড়ছেই আর বাড়ছেই, অফিসের মাইনে তো আর সেভাবে বাড়ে না ! বুবলু এবার অঙ্কে মোটেই ভাল করে নি, পাঁচের ঘরে নম্বর পেয়েছে, প্রগ্রেস রিপোর্টে ক্লাসটিচার বুবলুর অঙ্ক নিয়ে যত্নশীল হওয়ার উপদেশ দিয়েছেন। প্রাইভেট টিউটর রাখতে হবে কি ? সে'ও তো না হোক দুশো আড়াইশো টাকার ধাক্কা। বুবলু মাস্টারের কাছে পড়ছে দেখলেঁ মুনিয়া কি বায়না ধরবে না ? তাছাড়া ও বাড়িতে পিকলুও আছে...এক বাড়িতে থেকে শুধু একজনের জন্য টিউটর রাখাটা কি দৃষ্টিকটু দেখায় না ? দাদাকে অনুরোধ করবে, একটু সময় করে বুবলুকে অঙ্ক দেখিয়ে দিতে ? নাহ্, তাও হয় না। পিকলু পড়ে বউদির কাছে, বুবলুকে দাদার কাছে ঠেলে দেওয়াটা... ! উফ্, চিন্তায় চিন্তায় পাগল হয়ে যাবে ভাস্বতী

কলেজ স্ট্রিটে সন্ধ্যে নেমেছে। কী তাপ ছিল আজ দিনভর, শহরের ইঁট কাঠ পাথর থেকে এখনও তার ঝাঁঝ মিলোয় নি। চতুর্দিক ভিড়ে ভিড়াক্কার, একমুখী গাড়ির স্রোত জ্যামে পড়ে হাঁপাচ্ছে। গাড়িঘোড়ার অবিরাম বিষনিশ্বাসে আরও যেন তপ্ত হয়ে উঠছে জায়গাটা। চৈত্র মাসের মাঝামাঝি হয়ে গেল, এখনও একটা কালবৈশাখীর দেখা নেই।

বাস স্টপে দাঁড়িয়ে ভাস্বতী আঁচলে মুখ মুছল। ইয়ার এন্ডিং-এর কাজ চলছে অফিসে, বড্ড চাপ, ভারি ক্লান্ত লাগছে শরীরটা। তাও ভাগ্য ভাল, এখনও বুবলু মুনিয়ার ক্লাস শুরু হয় নি, এরপর কি করে যে কী সামলাবে!

পর পর দুটো মিনিবাস ছেড়ে দিল ভাস্বতী। থকথকে গাদাগাদি, মশা মাছি গলার জায়গা নেই, বই-এর ভারী প্যাকেট হাতে পাদানি ছোঁয়া অসম্ভব।

ভাস্বতী অসহায় মুখে ঝুম দাঁড়িয়ে। পায়ে পায়ে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ-এর দিকে চলে যাবে? সেখান থেকে মেট্রো ধরে বেলগাছিয়া? তারপর বাকি পথ হাঁটা? শরীর না চললে রিক্‌শাও নিয়ে নেওয়া যায়...

--ভাস্বতী...অ্যাই ভাস্বতী?

ভাস্বতী চমকে তাকাল। একটু তফাতে ফুটপাথ ঘেঁষে একটা মেরুনরঙা মারুতি জেন্‌। জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে ডাকছে এক রমণী।

—কিরে অ্যাই, চিনতে পারছিস না?

ভাস্বতীর ভুরু দু-এক সেকেন্ড জড়ো। তারপরই শিথিল হয়েছে ভাঁজ, —ঋতুপর্ণা!

গাড়ির দরজা খুলে নেমে পড়েছে ঋতুপর্ণা,—এতক্ষণ লাগল চিনতে রাস্কেল? আমি তোকে একবার দেখেই...

—কি করে চিনব? ভাস্বতী ক্লান্তি ভুলে পলকে উচ্ছল,—স্কুলে তোর মুখ লম্বা ছিল, এখন একদম গোল হয়ে গেছে! উফ্‌, কী মুটিয়েছিস রে তুই!

হি হি হাসছে ঋতুপর্ণা। হাত ধরল,—ইশ্‌, কতদিন পর দেখা!

—হুঁ। তা প্রায় পনেরো বছর। নাকি আরও বেশি?

—ধ্যাৎ। স্কুল ছাড়ার পর তো তোর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল।

হ্যাঁ, তা হয়েছিল বটে। কলেজে পড়ার সময়ে ন মাসে ছ মাসে কোন বন্ধুর বাড়ি দেখা হয়ে যেত বৈকি। কোনদিনই খুব একটা কাছের বন্ধু ছিল না ঋতুপর্ণা, এমন সহপাঠিনীর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্কুলের পরেই মোটামুটি শেষ হয়ে যায়। তবু আজ এতদিন পর ঋতুপর্ণাকে দেখে ভাল লাগছিল ভাস্বতীর। যেন কথা নেই বার্তা নেই, দুম করে আকাশ থেকে একটা স্কুলের দিন খসে পড়ল। ডানা মেলে ওড়ার দিন।

অপেক্ষমান যাত্রীরা ড্যাব ড্যাব করে দেখছে দুই বন্ধুকে। ঋতুপর্ণা ভাস্বতীর হাত টানল,—যাচ্ছিস কোথায়?

দায়সারা গোছের উত্তর দিল ভাস্বতী,—ফিরছি।

—তুই একটা যেন চাকরি করিস্‌ না? শিপ্রা না কে যেন বলেছিল? তোর কলেজ স্ট্রিট পাড়ায় অফিস নাকি?

—না, আমার অফিস ক্যামাক স্ট্রিটে। ছেলেমেয়ের বই কিনতে এসেছিলাম।

—ওমা তাই! তোর ক'টি?

—দুই। ছেলের থ্রি হল, মেয়ে নার্সারি টু।...তোর?

—সবেধন নীলমণি এক ছেলে। ক্লাস ফাইভ। ঋতুপর্ণা এদিক ওদিক তাকাল,—রাস্তায় দাঁড়িয়ে সব কথা হয় নাকি? চল্ চল্, আমাব বাড়ি চল্।

—নারে, দেরি হয়ে যাবে।

—কিছু দেরি হবে না। চল্ তো। এই তো সামনেই আমার বাড়ি।...তুই যাবি কোথায়?

—পাইকপাড়া।

—পাইকপাড়াতেই আছিস্? বাপের বাড়ির কাছেই বিয়ে হয়েছে বুঝি?

ভাস্বতী আড়ষ্ট ভাবে হাসল,—না, বাপের বাড়ি এসেছি।

—তাহলে আর ভাবনা কি? ছেলে মেয়ে তো সেফ কাস্টডিতে আছে। চল্ চল্, দু মিনিট বসে যাবি। আমার গাড়ি তোকে নামিয়ে দিয়ে আসবে।

ভাস্বতী আর আপত্তি করে পার পেল না। ঋতুপর্ণার পিছু পিছু গাড়িতে গিয়ে বসেছে। বিলাসী সিটে, অসহজ ভঙ্গিতে। যানবাহনে ঠাসাঠাসি পথেও ভারি মসৃণ চলছে গাড়ি, ঝাঁকুনি লাগছে না। ঋতুপর্ণা কলকল করেই চলেছে। স্কুলের কথা, পুরনো বন্ধুদের কথা। সুচরিতার সঙ্গে একদিন দেখা হয়েছিল, সুচরিতা এখন মেডিকেল কলেজের ডাক্তার, নীনার বর আমেরিকায় আছে, নীনা ওখানেই সেটল্ করেছে, তাদের বাংলার টিচার দীপ্তিদি ক্যানসারে মারা গেছেন...

কিছু শুনছিল ভাস্বতী, কিছু শুনছিল না। হুঁ হাঁ করছে মাঝে মাঝে। হঠাৎ বলল,—তোদের গাড়িটা ভারি সুন্দর। কলকাতা শহরের রাস্তায় চলছে বোঝাই যায় না।

—হুঁ হুঁ বাবা, দেখতে হবে তো কার পছন্দ! ঋতুপর্ণা চোখ ঘোরাল,—আমার বর তো ফিয়াট কেনার ধান্দা করছিল, আমি বললাম তোমার ফিয়াট প্রেম নিয়ে তুমি থাকো। আমার জন্য কিনতে হলে এই গাড়ি কিনতে হবে।...ভাবতে পারিস কী ক্রেজি, এখনও আদ্যিকালের ফিয়াটটা নিয়ে অফিস যায়!

মানে দুটো গাড়ি। ভাস্বতী একটু ঈর্ষান্বিত ভাবে জিজ্ঞাসা করল,—কি করে তোর বর?

—ওর তো কনস্ট্রাকশান বিজ্‌নেস। বিল্ডিং কনস্ট্রাকশান। মানে তোরা যাদের বলিস প্রোমোটার। দিনরাত কাজ কাজ আর কাজ। এই সাইটে ছুটছে,

ওই করপোরেশান অফিস, আজ এখানে, কাল ওখানে...এমা, তোর কথা জিজ্ঞাসাই করছি না! তোর বর কি করে রে?

ভাস্বতী থমকাল সামান্য। রণজয়ের প্রসঙ্গ তার একদম পছন্দ নয়, কিন্তু এই মুহূর্তে রণজয়ের অস্তিত্ব বুঝি পুরোপুরি অস্বীকার করাও যাবে না।

লঘু স্বরে বলল,--সে তোর বরের তুলনায় হেঁজিপেঁজি লোক। একটা প্রাইভেট কোম্পানীর অ্যাকাউন্ট্যান্ট।

ঋতুপর্ণা শুনল কিনা বোঝা গেল না। মারুতি জেন এক পুরনো আমলের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। বিডন স্ট্রিটে। গাড়ির দরজা খুলে ডাকল,--আয়।

চোখ ঘুরিয়ে কয়েক সেকেন্ড বাড়িটাকে দেখল ভাস্বতী। আগেকার দিনের বনেদি বাড়ি যেমন হয়? সেরকমই চেহারা। তবে বড্ড শ্রীহীন, দেখে মনে হয় বহুকাল কোন মিস্ত্রিটিস্ত্রির হাত পড়ে নি। এ বাড়িতে থেকে ওই মারুতি জেন চড়ে ঋতুপর্ণা?

অন্দরে ঢুকে ভুল ভাঙল। দোতলায়, যেদিকটায় ঋতুপর্ণারা থাকে, সেদিকটা একদম ঝকঝকে তকতকে। দেওয়ালে প্লাস্টিক পেন্ট, পেলমেট থেকে বাহারী পর্দা ঝুলছে, দামী দামী সোফা, প্রকাণ্ড টিভি, সুদৃশ্য ক্যাবিনেটে অ্যান্টিক শো-পিস্।

চওড়া ডিভানে ভ্যানিটি ব্যাগ ছুঁড়ে দিয়ে ঋতুপর্ণা বলল,--ওদিকটায় আমার জা ভাশুর দেওররা থাকে, আমরা এদিকটা আলাদা করে নিয়েছি...তুই হাত পা ছড়িয়ে বোস্ না। এসিটা একটু বাড়িয়ে দিই?

ভাস্বতী মোহিত হয়ে যাচ্ছিল। একটা কাঁটাও ফুটছিল কোথায়। স্কুলে লেখাপড়ায় তার থেকে অনেক নিরেস ছিল ঋতুপর্ণা, বাড়ির অবস্থাও এমন কিছু ভাল ছিল না, সেই মেয়ে এখন রীতিমত অর্ধেক পৃথিবীর অধিশ্বরী। দিব্যি নিজেরটুকু গুছিয়ে নিয়ে আলাদা করে বসেছে। দেখতে অবশ্য তার চেয়ে অনেক সুন্দর ছিল ঋতুপর্ণা। শুধু সৌন্দর্যের জোরেই বুঝি তার থেকে অনেক ধনী হয়ে গেছে মেয়েটা! অথচ কী আয়রনি, এখন সেই রূপোর আর ছিটেফোঁটাও নেই ঋতুপর্ণার! তাকে দেখে এখন এক মুটকি গিন্নি ছাড়া কিছু মনে হয় না। স্কুলে নিয়মিত স্ট্যান্ড করে, ভাল কলেজে পড়ে, নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে কি লাভ হয়েছে ভাস্বতীর! কিছু না করেই ঋতুপর্ণা তার থেকে অনেক বেশি পেয়ে গেল। একেই বোধহয় কপাল বলে।

ভেতর থেকে দ্রুত ঘুরে এসেছে ঋতুপর্ণা। সোফায় গা ছড়িয়ে বসল,--হ্যাঁ বল্, কি খাবি?

--কিছু নারে। শুধু এক কাপ চা।

--বন্ধুকে বাড়ি ডেকে এনে শুধু চা?...ফ্রিজে কটা ফ্রাই গড়া আছে, ভেজে

দিতে বলি ? মিস্টি টিস্টি খাস্ তো ? নাকি ডায়েটিং করছিস ?

ভাস্বতী এবার হেসে ফেলল,—না রে, কিছুই করছি না। সবই খাই, তবু কোন কিছুতেই গায়ে চর্বি লাগে না।

—আমায় হাট্টা করছিস্ ? কিছু না খেয়েই আমি মোটা হচ্ছি রে। বলতে বলতে হাঁক পেড়ে কাজের লোককে ডাকল ঋতুপর্ণা। নির্দেশ দিয়ে গুছিয়ে বলল আরও,—হ্যাঁ, কি যেন কথা হচ্ছিল আমাদের ?

—কিছু না তো। ভাস্বতী দ্রুত মাথা নাড়ল।

—না না, গাড়িতে কি যেন একটা কথা হচ্ছিল।...যাক গে। আজকাল কিছুই আর মনে রাখতে পারি না।

ভাস্বতী মুচকি হাসল। ঘাড় হেলিয়ে বলল,—তোর ছেলে কোথায় ?

ঋতুপর্ণা গলা নামাল,—ওর আজ ইংলিশের মাস্টারমশাই এসেছে। সোম বুধ শুক্র ইংলিশ, মঙ্গল বেস্পতি শনি বিজ্ঞান অঙ্ক। ইতিহাস ভূগোলের জন্য কোন টিচার রাখি নি, ও নিজে নিজেই পড়ে। আমার কর্তা বলছিল ইতিহাস ভূগোলও নেগ্‌লেক্ট করা ঠিক না, আই সি এস সির সময়ে ওই নিয়েও প্রবলেম হতে পারে। বাংলা ইতিহাস ভূগোল মিলিয়ে একটা টিচার পাওয়া যায় না ? তাহলে তিনটে সাবজেক্ট একজনের কাছে পড়তে পারে ?

আবার ভাস্বতীর বুকে একটা কাঁটা ফুটল। বুবলুর একটা টিউটর রাখবে কিনা ভেবে ভেবে ভাস্বতী জেরবার হয়ে যাচ্ছে, আর ঋতুপর্ণা... ! ঢোঁক গিলে ভাস্বতী বলল,—তোর ছেলে তো সবে ক্লাস ফাইভ বললি, এখনই এত টিউটর না রাখলেই নয় ?

—বারে, ছেলের রেজাল্ট খারাপ হলে কর্তা আমায় ছেড়ে দেবে ?

—তোর কর্তাকে তুই খুব ভয় পাস মনে হচ্ছে !

—ধুস্, ভয় পাব কেন ? ঝটিতি বলেই হাসছে ঋতুপর্ণা,—ভয় একটু পাইও বটে। সে মানুষ ভাল তো ভাল খুব ভাল, কিন্তু রেগে গেলে যে একেবারে নটরাজ।

—তাইই !

—তাই কি রে ? ওর রাগ তুই চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবি না। আমাদের আগের কালার টিভিটা তো আছড়ে আছড়ে ভাঙল।

—সেকি রে ! কেন ?

—দোস আমারই। কাজ থেকে ফিরেছে, কোন কারণে হয়তো মেজাজ খারাপ ছিল...আমায় একটু কফি করে দিতে বলল...আমার সেদিন খুব মাথা ধরে ছিল, শুয়েছিলাম। দুম করে বলে ফেলেছি মন্টুর মা তো আছে, তাকে গিয়ে হুকুম করো না !...ব্যস্, ওমনি খেপে আগুন।

ভাস্বতী স্তম্ভিত। এ যে রণজয়েরও বাড়া। রণজয়ের হাজারো বায়নাক্কা আছে ঠিকই, তবে ভাস্বতীর শরীর খারাপ শুনলে কক্ষনো তাকে এমন হুকুম করে না রণজয়।

মধ্যবয়সী এক মহিলা চা খাবার নিয়ে এসেছে। ভাস্বতীর সামনে ট্রে নামিয়ে চলে গেল ভেতরে।

ঋতুপর্ণা উঠে গরম ফিশফ্রাই-এর প্লেট ভাস্বতীর হাতে তুলে দিল,—তা একদিক দিয়ে ভেবে দেখলে তার রেগে ওঠাটা তেমন বিচিত্র নয়। পুরুষ মানুষ খেটেখুটে ক্লান্ত হয়ে ফিরেছে, বউএর মুখে তখন অমন কথা শুনলে রেগে যাবে না ? যে মানুষটা খেতে পরতে দিচ্ছে, বউএর কোন সাধ অপূর্ণ রাখে না—জানিস্, দু দিন পরেই আমাকে দোকানে হিড়হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে ওই জাম্বো কালার টিভিটা কিনে দিল।...শাসন যেমন করে, ভালও তো বাসে। এমন মানুষের মেজাজমর্জি বুঝে চলাটা কি আমারও কর্তব্য নয় ? জায়েদের সঙ্গে আমার বনছিল না...বুঝিসই তো বর আমাকে এত শাড়ি গয়না দিচ্ছে, সব চোখ টাটায়...কদিন ঘ্যানঘ্যান করতেই আলাদা হয়ে গেল। তুমি তোমার মতো মহল সাজিয়ে শান্তিতে থাকো। বলতে বলতে গলা নামাল ঋতুপর্ণা,—আমরা অবশ্য এ বাড়িতে আর বেশি দিন নেই। যোধপুর পার্কে আমার বর একটা বড় কমপ্লেক্সের কাজে হাত দিয়েছে, ওখানেই আমরা একটা ফ্ল্যাট রাখছি। বছর খানেকের মধ্যে উঠে যাব। তবে এ বাড়ির অংশও আমার বর ছাড়বে না, এদিকটা যেমন আছে বন্ধ করে রেখে যাব।

ভাস্বতী স্থির চোখে অচেনা সহপাঠিনীকে দেখছিল। তির্যক সুরে বলল,—তার মানে তুই বেশ আছিস !

—তা আছি রে। আমার অভাব কি বল্ ? মেজাজী লোকটাকে একটু মানিয়ে গুনিয়ে চলা আর কি। ভাস্বতীর মন্তব্যের শ্লেষটুকু ধরতেই পারল না ঋতুপর্ণা। আদুরে বেড়ালের মতো শরীর মোচড়াচ্ছে,—জানিস ও কি রকম ! বিয়ের পর, তখনও এর লাইনটা তেমন ধরে নি.....ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার তো, খুব স্ট্রাগল করত সে সময়ে...আমি একবার বলেছিলাম, তুমি এত খাটছ, আমিও নয় একটা চাকরির চেষ্টা করি। শুনেই চোখ লাল। মেয়েদের চাকরি করা ও একদম পছন্দ করে না। আমিও বাবা বেঁচে গেলাম। দিব্যি খাচ্ছি দাচ্ছি, ঘুমোচ্ছি, মার্কেটিং করছি।...শুধু একটু তার কথা মতো চলা।...তো হ্যাঁ রে, তোর কর্তাটি কেমন ?

ভাস্বতীর আর কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না। কষ্ট করে হাসল,—নাহ্, সে একেবারে মাটির মানুষ। সাত চড়ে রা কাড়ে না।

—ভাল ভাল, খুব ভাল। তা এখন আছিস কোথায় ?

—বললাম তো। পাইকপাড়ায়।

—সে তো বাপের বাড়ি। শ্বশুরবাড়ি কোথায় ?

মুহূর্তের জন্য একটা শূন্য ফ্ল্যাট ভাস্বতীব চোখের সামনে ভেসে উঠল। নির্জন নিরানন্দ এক মরুভূমি। ওই বাড়িটা কি ? ভাস্বতীর শ্বশুরবাড়ি ? নিজের বাড়ি ? নাকি নেহাতই রণজয়ের বাড়িতে আশ্রিত হয়ে বেঁচেছিল ভাস্বতী ? নিশ্চয়ই তাই। নাহলে অমন কুকুরের মতো তাড়িয়ে দিতে পারে !

ভাস্বতী হাসিটাকে ধরে রাখল,—আমার শ্বশুরবাড়ি ভবানীপুরে। বলেই ঘড়ি দেখছে,—অনেক দেরি হয়ে গেল রে। তোর ছেলেকে একবার ডাক, দেখে যাই।

ভাস্বতীর কথা ঘুরিয়ে নেওয়ার কায়দাটাও ধরতে পারল না ঋতুপর্ণা। এমন মস্তিষ্কহীন হয়ে গেছে এখন। সাজানো গোজানো এক পুতুল মাত্র। এমন হলেই কি সেও রণজয়ের সংসারে খাপে খাপে মিলে যেত ? উঁহু, রণজয় আরও ভয়ঙ্কর, সে তার উপার্জনটাও চায়। তাছাড়া এমন আত্মসম্মানবোধহীন হয়ে বেঁচে থাকা আর কি ভাস্বতীর পক্ষে সম্ভব ?

ফেরার পথে ঋতুপর্ণার গাড়িতে বসেই ঋতুপর্ণার ওপর করুণা হচ্ছিল ভাস্বতীর। বেচারা ঋতুপর্ণা, ঐশ্বর্য কাকে বলে বুঝলই না।

সেদিন টালিগঞ্জের ফ্ল্যাটে গিয়ে মনটা ভারি দুর্বল হয়ে গিয়েছিল ভাস্বতীর। ঋতুপর্ণা যেন জোরটা ফিরিয়ে দিল।

এমনও হয় !

॥ ছয় ॥

বুবলু মুনিয়ার স্কুল পুরোদমে শুরু হয়ে গেছে। নতুন এক রুটিন চালু হয়েছে ভাস্বতীর। সাড়ে আটটার মধ্যেই ছেলে-মেয়েকে তৈরি করে বেরিয়ে পড়ে, তাদের স্কুলে পৌঁছে দিয়েই হাঁপাতে হাঁপাতে অফিস, রোজ বড়বাবুর হাতে পায়ে ধরে অফিস ছুটির আগেই বেরিয়ে পড়া, হাঁচোড় পাঁচোড় করতে করতে স্কুলে ছোটা, তারপর বাড়ি। ফেরে যখন, তখন একেবারে হাক্লান্ত দশা। নিজেরও। ছেলেমেয়েরও। পনেরো দিনেই ভাস্বতী জেরবার হয়ে গেল।

তবু এভাবেই চলতে হবে এখন। উপায়ই বা কী! এর মধ্যেই খানিকটা ছন্দ খুঁজে নিতে হবে সংসারে।

নিয়েছেও ভাস্বতী। বুবলু পিকলু এখন এক ঘরে থাকে, মুনিয়াকে নিয়ে ভাস্বতী শোয় মার খাটে। হিমানীর খাটটা খুব চওড়া নয়, তিন জনে শুলে বেশ চাপাচাপি হয়, কিন্তু কী আর করা! নিজেদের মালপত্রও সব মার ঘরে। হিমানীর আলমারি, হিমানীর আলনা, সবেতেই এখন ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ভাব। এক-তলায় ভাড়াটে রয়েছে, দোতলার তিনখানা ঘরেই ভাগাভাগি করে থাকতে হবে সকলকে। দাদুর দস্তানার মতো।

অসুবিধে কি শুধু এইটুকুই! এক ধরনের জীবনে ভাস্বতীরা অভ্যস্ত হয়েছে দীর্ঘদিন, অন্য ধরনের জীবন যাপন মেনে নেওয়া খুব শক্ত। বুবলু মুনিয়া মাছ দেখলে নাক সিঁটকোয়, ও বাড়িতে মাংস আর ডিমই হত বেশি। এখানে দু বেলা শুধুই মাছ, মাংস আসে ছুটির দিনে, ব্রেকফাস্টের টেবিলে ছাড়া ডিম খাওয়ার বড় একটা চল নেই। যাদবপুরে রাত দশটার আগে কস্মিনকালে খাওয়া হত না, এ বাড়ির নিয়ম একদম আলাদা। সাবেকি নিয়ম। সওয়া নটার মধ্যে খাওয়া দাওয়া সারো, তার পর ইচ্ছে মতো টিভি দেখো, বই পড়ো, গান শোনো। শ্রান্ত অবসন্ন বুবলু মুনিয়া বাড়ি ফিরেই ঘুমিয়ে পড়ে, অগত্যা খাওয়ার পর তাদের পড়াতে বসে ভাস্বতী। শরীর ভেঙে আসে তখন তার।

এ তো গেল সরল অসুবিধে। সংসারে কিছু জটিল সমস্যাও আছে। খুব সূক্ষ্ম। এত সূক্ষ্ম যে সাদা চোখে দেখা যায় না, মর্মে মর্মে অনুভব করতে

হয়। ভাস্করের চাকরি ব্যাংকে। কাছেই, বেলগাছিয়ায়। ভারী জলখাবার খেয়ে অফিস যায় ভাস্কর, দুপুরে টুক করে স্কুটার নিয়ে খেতে আসে বাড়িতে। পিকলুর স্কুল এগারোটায়, সেও পাড়াতেই। তারও সাতসকালে খাওয়ার তাড়া নেই। রিনা সামান্য ঢিলেঢালা ধরনের গৃহিণী, ধীরে সুস্থে রান্না করে, ঘর সামলায়, তাতেই এ বাড়ির চলে যাচ্ছিল এতদিন। ভাস্বতীদের জন্য দিন সাতেক সকালে হুটোপুটি করেই রিনার মুখ হাঁড়ি। দেখে শুনে ভাস্বতী নিজেই হাল ধরল। ভোর ভোর উঠে হেঁসেলে ঢুকে পড়ে, ছেলেমেয়ের খাবার বানায়, টিফিন তৈরি করে, সঙ্গে সঙ্গে নিজের জন্যও বন্দোবস্ত করে ফেলে যা হোক। এতেও যে রিনা খুব প্রসন্ন, তা নয়। রান্নাঘরই যার রাজ্যপাট, সে কি আর সহজে তার দখল ছাড়তে চায়! একটুখানির জন্যই ঢুকুক ভাস্বতী, কী সারা দিনের মনে, রিনার কৌটোবাটা নিয়েই তো খবরদারি! তবে এ ব্যবস্থা মন্দের ভাল, প্রভাতী নিদ্রাটা ছাড়তে হচ্ছে না রিনাকে। ভাস্বতীও বউদির মনস্তত্ত্ব বুঝে ফেলেছে, ভোরের সময়টুকু ছাড়া পারতপক্ষে সে রান্নাঘর মাড়ায় না।

বুবলু মুনিয়ার জামা প্যান্টও এ বাড়ির কাজের লোককে কখনও কাচতে দেয় না ভাস্বতী, নিজেই সাবান ঘষে রোজকারটা রোজ। দরকার কী, যদি মালতী পুট করে কিছু বলে বসে! বিয়ের পর বাপের বাড়ি বেড়াতে আসা এক কথা। কিন্তু পাকা ঘাঁটি গাড়তে গেলে অনেক ব্যাপারেই চোখ বুজে থাকতে হয় মেয়েদের, অনেকটাই জমি ছেড়ে দিতে হয়। ভাস্বতী জানে। বউদির মন রাখতে প্রায়শই কিছু না কিছু কিনে আনে সে। লিপস্টিক নয় পারফিউম, নয় নেল পালিশ, নিদেন পক্ষে ঘর সাজানোর টুকিটাকি। ছুটির দিনে কোমর বেঁধে নেমে পড়ে, নিজের হাতে ঝাড়াঝুড়ি করে গোটা বাড়ি। তাতেও যেন রিনার মনের তল পায় না। হঠাৎ হঠাৎ এমন গম্ভীর হয়ে যায় রিনা, এমন সব কান্ড করে! বুবলু সেদিন পিকলুর ক্যারামের স্ট্রাইকার হারিয়ে ফেলল, বউদি পিকলুকে চড় মারল ঠাস ঠাস। বোকা ছেলে, নিজের জিনিস সাবধানে রাখতে পারো না! ভাস্বতী দেখেও দেখেনি, শুনেও শোনেনি। আড়ালে ধমকেছে বুবলুকে।

জীবজন্তুর মতো বাচ্চারাও নিজেদের অসহায় অবস্থাটা টের পেয়ে যায়, পিকলু ডাকলেই বুবলু আর দিশেহারা হয়ে ক্যারাম খেলতে ছোটে না। পিকলুকে ভীষণ ভালবাসেন হিমানী, পিকলুই তাঁর নয়নের মণি, ইদানীং সেই আদরেও ভাগ বসিয়েছে বুবলু মুনিয়া, এতেও কি রিনা খানিকটা অপ্রসন্ন? রিনার সামনে বুবলু মুনিয়া যেন দিদাকে একটু এড়িয়ে এড়িয়ে চলে!

তা এ ভাবেই তো এখন দিন কাটাতে হবে বুবলু মুনিয়াকে। বাবা মার বনিবনা না হলে ছেলেমেয়ের এই হালই হয়। তাও তো তাদের মামা ভাল।

স্নেহশীল, সহৃদয়। মাঝে মাঝে এটা ওটা কিনে দিচ্ছে, একদিন পরেশনাথের মন্দিরে বেড়িয়ে আনল, আরেক দিন এয়ারপোর্ট। ভাস্বতী এর বেশি আর কী আশা করে!

এরই মধ্যে একদিন ছোটখাটো খিটিমিটি বেধে গেল। মার সঙ্গে। মেট্রো রেলে আগুন লেগেছিল সেদিন, ঝাড়া একটি ঘন্টা ছেলে-মেয়ে নিয়ে ট্রেনে আটকে ছিল ভাস্বতী, ফলত ফিরতে অনেক রাত হয়ে যায়। ভিড়ে ভয়ে ক্ষিধেয় ক্লান্তিতে বুবলু মুনিয়া তখন প্রায় আধমরা।

বাড়ি ঢুকতেই হিমানী বললেন—এবার বুঝতে পারছ তো কাজটা ঠিক করনি?

ভাস্বতীর তখন মাথার ঠিক নেই। ঝাং করে বলে উঠল—ট্রেন যদি তোমার জামাইয়ের মতো বদমেজাজি হয়, আমি কী করব?

—জামাই বদমেজাজি, না তুমি, সে খবর কে রাখে!

—আমাকে তুমি বিশ্বাস করো না মা?

—বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা ছাড়। তুই ভাব, তুই মা, না পিশাচ! ওইটুকু টুকু শিশুদের ওপর যা নয় তাই অত্যাচার করছিস!

—অত্যাচার করছি আমি! আমার খাটুনি যাচ্ছে না? আমার কষ্ট হচ্ছে না?

—সে তো তোমার নিজের জেদের জন্য। মেয়েমানুষের অত জেদ কীসের? পুরুষমানুষের মাথা গরম হলে, মেয়েমানুষকে একটু নত হয়ে থাকতে হয়। তুমি ফিরে গেলে জামাই কি তোমায় তাড়িয়ে দেবে?

কান ঝাঁ ঝাঁ করছিল ভাস্বতীর, রক্তে আগুন ছুটছিল। নিজের মা যদি এ কথা বলে, পায়ের নীচে মাটিটা কোথায় থাকে! যে মানুষটা দেড় মাসে একবারও খবর নেয় না, তার সাত খুন মাপ, সব দোষ শুধু মেয়ের! অনেক টাকা খরচা করে বিয়ে দিয়েছিল বলেই কি এত আক্ষেপ মার! এত বিরক্তি।

ভাস্বতী তেড়ে মেড়ে মাকে কিছু বলতে যাচ্ছিল, পারল না। তার আগে বউদি ঢুকে পড়েছে ঘরে—কী তোমরা মায়ে ঝিয়ে ঝগড়া আরম্ভ করলে বলো তো? বাচ্চাগুলো যে বাইরে ভয়ে কাঁপছে!...মার নয় বয়স হয়েছে, শরীর খারাপ, যা মুখে আসে বলে দেন, তা বলে যদি তুমিও...। যাও যাও, মুখ হাত ধুয়ে নাও। পেটে কিছু পড়লে মাথা ঠান্ডা হয়ে যাবে।

অনেকক্ষণ সেদিন স্নান করেছিল ভাস্বতী, তবু তাপ কমেনি। ভেতরটা জ্বলছিল। দুঃখে তাপে বিদীর্ণ হচ্ছিল হৃদয়। বউদির সহানুভূতি যেন আরও গভীর অপমান। নিশ্চয়ই মজা পেয়েছে বউদি, হাসছে মনে মনে।

স্নান সেরে ছাদে গেল ভাস্বতী। এই জায়গাটাই এ বাড়ির একমাত্র নির্জন

আশ্রয়। জমাট অন্ধকারে দূরে টালার ট্যাঙ্কের আভাস দেখা যাচ্ছে, আরও গভীর আঁধারের মতো।

এগারো বছরের ছোট ছোট স্মৃতি মনে পড়ছিল ভাস্বতীর। আবার। প্রায়ই মনে পড়ে আজকাল। সুখের স্মৃতি। দুঃখের স্মৃতি। হানিমুনে আগ্রা গিয়েছিল দুজনে, গাঢ় অমাবস্যায় অপার্থিব সৌধের পানে চেয়েছিল সারা রাত। কী নীরব, অথচ বাঙ্ময় ছিল সেই রাত্রি। কালচে নীল আকাশ ভরে আছে ঘাস ফুলে, আর অনন্ত এক চাঁদোয়ার নীচে তারা দুজন স্বপ্নে, কল্পনায়, ভালবাসায়...। রাতটা কি মিথ্যে ছিল ?

বুবলু হওয়ার পর বিকোলাই হয়েছিল ভাস্বতীর, কী সেবাটাই না করেছিল রণজয় ! অফিস ছুটি নিয়ে মাথার কাছে বসে আছে, কপালে জলপটি দিচ্ছে, মাথায় আইস ব্যাগ চাপছে, ঘড়ি ধরে ওষুধ খাওয়াচ্ছে বার বার। এক রাতে কী একটা শব্দে ভাস্বতীর ঘুম ভেঙে গেল, চমকে দেখল তার মুখের দিকে স্থির চেয়ে আছে রণজয়। হাল্কা সবুজ রাতবাতি জ্বলছে ঘরে, সেই আলোতে কী অপরূপ যে দেখাচ্ছিল রণজয়কে ! ওই রূপ কি তবে মিথ্যে ছিল ? অথবা ওই আলোটা ?

মুনিয়া যখন হল চোখ থেকে খুশি ঠিকরোচ্ছিল রণজয়ের। ভাস্বতী, ভাস্বতী, আমি আর জীবনে কিচ্ছু চাই না ! সেদিনের সেই অনাবিল খুশিটাও মিথ্যে ছিল ?

ছিল তো বটেই। না হলে সেই মুনিয়াকে নিয়ে অত বড় নোংরা কথাটা বলে রণজয় ! সপাটে ভাস্বতীর গালে থাপ্পড় মারল বুবলুর সামনে। ঘরের কোণে ছিটকে পড়ে কাতরাচ্ছে ভাস্বতী। অনেক হয়েছে, তোমার মতো ইতরের সঙ্গে আমি আর একটা দিনও থাকব না। আছিস কেন ? পিরিতের নাগরের হাত ধরে বেরিয়ে যা না। ফের যদি ঢুকবি তো ছাল আমি ছাড়িয়ে নেব।

ভাস্বতীর বুক নিংড়ে দীর্ঘশ্বাস গড়িয়ে এল। এই ছবিটাই শুধু সত্যি। রণজয় ভুলে গেছে কী রক্ত জল করা পরিশ্রম দিয়ে ভাস্বতী তিলে তিলে সংসারটাকে গড়েছিল। দাদাদের সঙ্গে খিচিমিচি বাধল, ভবানীপুরের অত বড় পৈতৃক বাড়ি ছেড়ে ঢাকুরিয়ার দাসপাড়ায় দুটো মাত্র খুপরি খুপরি ঘরে উঠে এল রণজয়। ভাস্বতী একটি দিনের তরেও অনুযোগ জানায়নি। আলো নেই, বাতাস নেই, জল নেই, তাই সই। উল্টে খুঁটে খুঁটে পয়সা জমিয়েছে। শুধু নিজের চাকরির টাকায় সংসার চালিয়েছে কতদিন, তবে না রণজয় ফ্ল্যাটটা কিনতে পারল। শাড়ি কিনত না, গয়না গড়াত না, কণামাত্র বিলাসিতা ছিল না, মধ্যবিত্তের সাধ বলতে তো টিভি আর ফ্রিজ, তাও কিনল কতকাল পর— কী কৃচ্ছ্রসাধনের পর্বটাই না গেছে ! বাবা তখন বেঁচে। তিনি পর্যন্ত ঠাট্টা করে

বলতেন, তুই তো এমন ছিলি না বুলু! নাটক নভেল পড়তিস, সিনেমা থিয়েটার দেখতিস...সব ভুলে এত সংসারী হয়ে গেলি তুই!

সংসার! সংই সার। সব ভুলে গেছে রণজয়। একটা মিথ্যে সন্দেহকে সত্যি করে তুলতে নিজের ছেলেমেয়েকেও ভুলে গেছে।

ভাস্বতীকে ভুলবে এ আর নতুন কথা কী!

॥ সাত ॥

রণজয় ভাস্বতীকে ভোলেনি। ছেলেমেয়েকেও না।

এ কথা ভাস্বতী টের পেল ছেলেমেয়ের গরমের ছুটির আগের দিন। স্কুলে তাদের নিতে এসে।

বুবলু মুনিয়া দারোয়ানের ঘরে ছিল, রোজকার মতোই। অন্য দিন মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে থাকে, আজ দুজনেই খুশিতে ঝলমল।

—মা মা, বাবা এসেছিল আজ। এক্ষুনি চলে গেল।

—বাবা আমাকে একটা অ্যাত্ত বড় ক্যাডবেরি দিয়েছে।

—অ্যাই মুনিয়া, আইসক্রিমের কথা বললি না তো!

—হ্যাঁ হ্যাঁ। মিলক্ বার। ...জানো মা, বাবা খুউব রোগা হয়ে গেছে।

—হবে না! বাবার যে খুব অসুখ করেছিল।

ভাস্বতীর বুকটা চিনচিন করে উঠল। কেন করল? রণজয়ের অসুখের খবর শুনে? মানুষটা তবে তত সুখে নেই যতটা সে ভাবছিল? থার্মোমিটারের পারা একশো ছুঁলেই শিশুর মতো হয়ে যায় রণজয়। বায়না আবদার করে, ভুল বকা শুরু হয়, মরে যাব মরে যাব আর্তনাদ করে, এক মুহূর্তের জন্যও ভাস্বতীকে ছাড়তে চায় না। একা বাড়িতে অসুস্থ হয়ে নিশ্চয়ই খুব কষ্ট পেয়েছে রণজয়! কিন্তু তার জন্য তো রণজয় নিজেই দায়ী। ভাস্বতী অনর্থক দুঃখ পাবে কেন?

তবে কি ছেলেমেয়ের মলিন মুখে আজ খুশির ঝলক দেখে ভাস্বতীর বুক চিনচিন? যে বুবলু মুনিয়ার জন্য ভাস্বতীর মন সদাই উথাল পাথাল, সারা দিনে এক সেকেন্ড নিঃশ্বাস নেওয়ার সময় পায় না, একবার বাবাকে দেখেই তারা এত বিগলিত? ছেলেমেয়েকে কি নির্বাসনে রেখেছে ভাস্বতী?

বিকেল পড়ে এসেছে। বৈশাখী সূর্য ঈষৎ দয়ালু এখন। ছোট ছোট হাওয়া উঠছে, কাগজ পাতা উড়ছে রাস্তায়, গলা পিচে আটকে যাচ্ছে খড়কুটো। নাগরিক পাখিরা এবার ঘরে ফিরবে।

ছেলেমেয়ের হাত ধরে ট্রাম লাইন পার হল ভাস্বতী, সিঁড়ি বেয়ে মেট্রো স্টেশনে নামল। শীতল ভূগর্ভে দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ। এই অঞ্চলটা

অফিসপাড়া নয়, অল্প কিছু যাত্রী অলস মেজাজে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। ক্লোজ সার্কিট টিভিতে চোখ রাখলে দেখা যায় তাদের আনাগোনা। উল্টো দিক থেকে নিঃসাড়ে একটা ট্রেন এসে দাঁড়াল, প্রায় সরীসৃপের মতো। গলগল উগরে দিচ্ছে মানুষ।

আবার সরীসৃপ মিলিয়ে গেল।

হঠাৎ ভাস্বতীর হাত ধরে টানল বুবলু—মা, বাবা আজ রাহুলমামার কথা জিজ্ঞেস করছিল।

ভাস্বতীর স্নায়ু টান টান— কী বলছিল ?

—এই রাহুলমামা আমাদের কাছে আসে কিনা, কোথাও আমাদের বেড়াতে নিয়ে যায় কিনা...বুবলু ঢোঁক গিলল—আমি কিন্তু কিচ্ছু বলিনি মা।

মুনিয়াও বলে উঠল—আমিও কিছু বলিনি।

ভাস্বতী গম্ভীর হল—বলনি কেন ? যা সত্যি তাই বলবে। রাহুলমামা তো তোমাদের কাছে আসেই। কত কী খাওয়ায় তোমাদের, কত আদর করে, ভালবাসে...

—বারে, এ সব কথা বললে বাবা রেগে যাবে না ?

—রাগ করার কী আছে। ভাস্বতী একটু ঝেঁঝে উঠল—রাহুলমামা কি খারাপ লোক ?

—আমি তাই বলেছি ? তুমি কিচ্ছু বোঝ না মা।

বুবলুর স্বরে স্পষ্ট অভিমান। ওইটুকু ছেলেও ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝে গেছে বাবার মনে কাঁটাটা কোথায়। কাঁটা, না বিষ ? ভাস্বতীর মুখ শুকনো হয়ে গেল। ছেলেমেয়ের চোখে মাকে ছোট প্রতিপন্ন করলে তাদের যে কোনও মঙ্গল হয় না, সে বোধও হারিয়েছে রণজয়।

ট্রেন এসে গেছে। ফাঁকা কামরা। উঠেই ছেলেমেয়ে নিয়ে বসার জায়গা পেয়ে গেল ভাস্বতী। সামনেই এক ফ্রেমে আঁটা পেন্টিং। এক লোলচর্ম বৃদ্ধার মুখ। ভাস্বতী দেখছিল।

মুনিয়া মার কোল ঘেঁষে এল—আমরা বাবার কাছে কবে যাব মা ?

মেয়ের মাথায় আলগা হাত বোলাল ভাস্বতী—কেন, মামার বাড়িতে থাকতে তোদের ভাল লাগছে না ?

—একটুও না।

—সে কী। তোরাই তো মামার বাড়ি যাওয়ার জন্য লাফাতিস।

—তা বলে এতদিন ধরে কেউ মামার বাড়িতে থাকে ! বুবলুর স্বর করুণ —স্কুলের সবাই বলে, তোরা স্কুল বাসে যাস না কেন রে ? আর কতদিন

মামার বাড়িতে থাকবি ?

—শুধু এই জন্য ভাল লাগে না ?

—তা নয়। পিকলুদাদাও বলছিল...বুবলু ঝপ করে থেমে গেল।

ভাস্বতীর ভুরু জড়ো,—কী বলছিল বল ?

বুবলু নিরুত্তর।

তীক্ষ্ণ চোখে ছেলেকে দেখল ভাস্বতী। একটু আগের উচ্ছলতার চিহ্নমাত্র নেই ছেলের মুখে, ঘন মেঘ চোখে থমথম করছে। পিকলু কি কোনও টিটকিরি মেরেছে বুবলুকে ?

ভাস্বতী গলা কোমল করল—কী বলেছে পিকলুদাদা বল না আমাকে। আমি মামাকে বলে দেব।

বুবলুর ঘাড় হেঁট। একবার চোখ তুলেই নামিয়ে নিল।

—ঠিক বাবার মতো জেদি। ভাস্বতী হিসহিস করে উঠল—বলবি না তুই ? বলবি না ?

প্রতিক্রিয়াহীন বুবলুর দিকে তাকিয়ে ভাস্বতী গোমড়া হয়ে গেল। গুমগুমে গলায় বলল,—ঠিক আছে, নয় না-ই বললি। আমি পিকলুকে জিজ্ঞেস করে নেব।

—না, তুমি পিকলুদাদাকে কিছু বলবে না।

—তাহলে তুই বল্ কি বলেছে।

বুবলু নিরুত্তর। মুনিয়াও কেমন যেন চোখে তাকাচ্ছে বুবলুর দিকে। ও কি জানে কথাটা ? মুনিয়াকে জিজ্ঞাসা করাটা কি ঠিক হবে ?

ভাস্বতী সামান্য দিশেহারা বোধ করল। কি এমন কথা যে ছেলে কিছুতেই বলতে পারছে না ? অবশ্য হাল্কা বিদ্রূপও অনেক সময়ে শিশুদের মনে তীব্রভাবে বেঁধে। কিন্তু বিদ্রূপই বা পিকলু করবে কেন ? পিকলু বুবলু মুনিয়াকে খুব ভালবাসে, তার মধ্যে আমার বাড়ি তোর বাড়ি, আমার জিনিস তোর জিনিস, হিংসে টিংসে একদম নেই। পিসতুতো ভাইবোনকে রাতদিনের সঙ্গী পেয়ে তাকে তো মহা খুশিই মনে হয়। তবে কি ওই দশ বছরের ছেলের গলায় অন্য কারুর স্বরের প্রতিধ্বনি শুনেছে বুবলু ? হতেই পারে। সেদিন বউদির মা এসেছিল, তার সঙ্গে খুব গুজগুজ করছিল বউদি, ভাস্বতী ঘরে ঢুকতেই কথা বন্ধ হয়ে গেল। নিশ্চয়ই তাকে নিয়েই আলোচনা চলছিল ! বর ছেড়ে ভাস্বতী বাপের বাড়িতে ছেলেমেয়ে নিয়ে বসে আছে, মা মেয়ের কাছে এটাই তো এখন সব থেকে বড় খোরাক।

মরুক গে যাক, ভাস্বতী ওসব আমল দেবে না। দাদা তার পাশে আছে, বউদির হীনতা সে গায়ে মাখবে কেন ? ও বাড়ি যতটা বউদির, তার চেয়ে

বেশি কি ভাস্বতীর নয় ?

পার্ক স্ট্রিট থেকে কামরায় লোক বেড়ে গেছে, এসপ্ল্যানেডে এসে থইথই। অন্যমনস্ক ভাস্বতীর বুকের আঁচল সরে গেছে সামান্য। একজন মধ্যবয়স্ক অফিসফেরতা গলায় টাই হাতে ব্রিফকেস মানুষ হ্যান্ডেল ধরে ঝুঁকছে ভাস্বতীর সামনে, চোখ গেঁথে আছে বুকের খাঁজে।

সচকিত ভাস্বতী বিরক্ত মুখে আঁচল গুছিয়ে নিল। মুনিয়াকে আলতো জড়িয়ে নিয়ে ঝুঁকল বুবলুর দিকে। গলা নামিয়ে বলল,—পিকলুদাদা কি বলেছে তাই নিয়ে মন খারাপ করতে হবে না। কাজের কথা শোন। বাবা যে স্কুলে এসেছিল এ কথা বাড়ি গিয়ে বলার দরকার নেই।

বুবলু মুনিয়া চোখ চাওয়াচাওয়ি করছে।

ভাস্বতী আবার বলল,—কাউকে বলতে হবে না।

—কেন মা ?

—কেন আবার কি ! আমি বলছি ব্যস্, আমার কথা শুনবে। দিদাকেও বলতে হবে না।

বুবলু কি যেন ভাবছে। হঠাৎ বলল,—আমরা কি কোনদিন আর বাড়ি ফিরব না মা ?

কথাটা ফুটল ভাস্বতীকে। তবু বলল,—এই তো বাড়ি ফিরছি।

—তুৎ, ও তো মামার বাড়ি।

—ওটাই এখন তোমাদের বাড়ি। ওখানে কি তোমাদের কোন অসুবিধে হচ্ছে ?

—হচ্ছেই তো। বলতে বলতে মুনিয়ার দিকে তাকাল বুবলু,—ওখানে তো আমাদের একটা ঘর ছিল, এখানে ঘর কোথায় ? আমার সব কিছু ও বাড়িতে পড়ে আছে।

—কি কি লাগবে লিস্ট করে দিও। এনে দেবখন।

—ইহ্, এনে দেব ! বুবলু অপ্রত্যাশিত ভাবে ঝেঁঝে উঠল,—আমার ঘরে আমি সৌরভের পোস্টার লাগাব বলেছিলাম, পিকলুদাদার ঘরে লাগানো যাবে ? পিকলুদাদা তো শচীনের ফ্যান। আর মামা দেওয়ালে কিছু লাগাতেই দেবে না। সেদিন রঙপেনসিল দিয়ে মুনিয়া একটা সান এঁকেছিল, তাই বলে মামা কত বকল।...ওখানে আমাদের খাটটাও কত বড় ছিল, পিকলুদাদার খাটে দুজন আঁটেই না। পিকলুদাদার শোওয়াটাও কী খারাপ ! শুধু সারা রাত লাথি মারে।

—আহ্ বুবলু ! ইচ্ছে করে কি পিকলুদাদা লাথি মারে নাকি ?

—ইচ্ছে করে না মারুক, মারে তো। আমার ভাল লাগে না। বুবলু

ফোঁস ফোঁস করছে,—এখানে আমার বইখাতা রাখার আলাদা টেবিল নেই, জামাকাপড় রাখার আলমারি নেই, ফ্রিজ খুলে জল খেলে মামি রাগ করে...স্ট্যাম্প জমানোর খাতাটা পর্যন্ত যাদবপুরে রয়েছে। রাজা সনু জোজোদের সঙ্গেও কত দিন দেখা হয় নি! সব কিছু তুমি মামার বাড়িতে এনে দিতে পারবে?

ভাস্বতীর মুখ চূন হয়ে গেল। তবু শক্ত গলায় বলল,—অত বায়নাক্কা কোরো না বুবলু। মানিয়ে নিতে শেখো। তোমার যা যা দরকার সবই তোমায় আস্তে আস্তে দেওয়া হবে।

ফাঁপা আশ্বাসটুকু কি ধরে ফেলেছে বুবলু? অমন চোখে ভাস্বতীকে দেখে কেন? আচমকা মায়ের কানের কাছে মুখ নিয়ে এল। ফিসফিস করে বলল,—বাবা আর তোমার সঙ্গে ঝগড়া করবে না মা। আমরা বাবাকে বকে দেব।

অজান্তেই চোখের পাতা ভিজে গেল ভাস্বতীর। ঠোঁট কামড়ে মুখ ফিরিয়েছে মেট্রো রেলের জানলায়। সুড়ঙ্গপথে ছুটছে ট্রেন, বাইরে ধূসর দেওয়াল ছাড়া কিছুই দেখা যায় না। দুলছে ট্রেন, শব্দ বাজছে ঝমঝম ও কি ট্রেনের শব্দ? না হৃদয়ের?

বুবলু নাক টানছে। ধরা গলায় বলল—চল না মা, আমরা বাড়ি ফিরে যাই।

মুনিয়াও অল্প অল্প ফোঁপাতে শুরু করেছে—চলো না মা, বাবার জন্য খুব মন কেমন করছে।

ভাস্বতীর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। রাগের সঙ্গে রাগ নিয়ে লড়াই করা যায়, অভিমানের সঙ্গে অভিমানের যুদ্ধ হয়, জেদের সঙ্গেও জেদের পাঞ্জা কষা চলে, কিন্তু সন্তানদের এই করুণ আর্তির কাছে মা যে কী ভীষণ অসহায়!

রাত্রে ঘুম আসছিল না ভাস্বতীর। কবেই বা আসে! ভাবছিল শুয়ে শুয়ে। একটা ভাবনা থেকে একটা ভাবনা, সেখান থেকে আরেকটা। ছেলেমেয়েকে বাবার কাছ থেকে সরিয়ে এনে সে কি ভুল করেছে? প্রতিটি শিশুই বাবা মাকে নিয়ে এক সুস্থ স্বাভাবিক সংসারে বাস করতে চায়, নিজের জন্য প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে ভাস্বতী কি তাদের সেই প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করল? রণজয়টাও কী বজ্জাত একদিন মুখ দেখিয়েই নিপুণ শিকারীর মতো ঘায়েল করে ফেলল ছেলেমেয়েকে! না না, তাই বা কেন? যন্ত্রণাটা বুবলু মুনিয়ার মধ্যে ছিলই, বাবাকে দেখে নতুন করে ক্ষরণ শুরু হল। রণজয় হয়তো সত্যিই মনে মনে অনুতপ্ত হয়েছে! প্রকাশ্যে নত হতে না

পেরে ছেলেমেয়ের মাধ্যমে... ! তা হলে রাহুলের কথা তুলল কেন রণজয় ? ঈর্ষা, না কৌতূহল ? বুবলু মুনিয়াকে বাবার কাছে পাঠিয়ে দেবে ভাস্বতী ? অসম্ভব। ভাস্বতী তবে থাকবে কী নিয়ে ?

অসংখ্য 'যদি' 'তবে' 'কিন্তু' 'অথবা' পাক খাচ্ছে ভাস্বতীর মস্তিষ্কে। এক সময়ে রাতটা সকাল হয়ে গেল।

।। আট ।।

কটা দিন ভাবল ভাস্বতী। ভাবল...ভাবল...

ভাবনারা খুব বেশি ভিড় করতে থাকলে মনের মধ্যে এক উৎপীড়ন শুরু হয়ে যায়। মনে হয় কেউ বুঝি অবিরাম কড়া নেড়ে চলেছে দরজায়, অথবা কেউ যেন একটানা টিপে ধরে আছে বাড়ির কলিংবেল। চাপটা বড় অসহনীয়, মস্তিষ্ক ভোঁ ভোঁ করে সারাক্ষণ। খাওয়ায় এতটুকু রুচি হয় না, ঘুম মানে শুধুই বিছানায় এপাশ ওপাশ করা, মেজাজও সারাক্ষণ তিরিক্ষি হয়ে থাকে। কি বাড়িতে, কি অফিসে।

সেদিন অফিসে তো একটা সিনই ক্রিয়েট করে ফেলল ভাস্বতী। প্রৌঢ় বড়বাবুর সঙ্গে হঠাৎ ঝগড়া বেধে গেল। প্রায় অকারণে।

দোষের মধ্যে দোষ, বড়বাবু কয়েকটা চিঠি দিয়ে বলেছিলেন,—এগুলো একটু দেখেশুনে টাইপ কোরো ভাস্বতী। ইম্পর্ট্যান্ট চিঠি। দেখো, স্যালারি স্টেটমেন্টের মতো এতে আবার ভুল কোরো না।

ভাস্বতী চড়াং করে তেতে গেল,—আমি দেখেই টাইপ করি। স্যালারি স্টেটমেন্টে অত কাটাকুটি থাকলে ভুল হবেই। যারা স্টেটমেন্ট তৈরি করে তাদের কিছু বলতে পারেন না ?

চকিত আক্রমণে বড়বাবু থতমত,—ওভাবে কথা বলছ কেন ? আমি কি তোমাকে অ্যাকিউজ করেছি ? শুধু বলছি একটু সাবধানে...

—সাবধান ফাবধান দেখাবেন না। কে কত সাবধানী আমার জানা আছে। নিজে তো আমাদের এরিয়ার বিলগুলো চেক করেছিলেন, তবু জি. এম-এর কাছে ধ্যাতানি খেতে হল কেন ?

—সেটা আমার ভুল ? সে তো অ্যাকাউন্ট্যান্টের দোষ। রমেশ যোগে গণ্ডগোল করেছিল....

—ওই হল। সবাই সমান। আর উপদেশের বেলায়, ভাস্বতী ঠিক করে টাইপ কোরো ! যেন আমরাই শুধু...

গোটা অফিস হাঁ করে তাকিয়ে আছে ! নিরীহ বড়বাবুর সঙ্গে এ কি ভাষায় কথা বলছে শান্তশিষ্ট স্বল্পবাক ভাস্বতী ! মাথা নীচু করে চেয়ারে ফিরে গেছেন

বড়বাবু। ক্ষণ পরে ভাস্বতীর চৈতন্য ফিরল। ঝাঁ ঝাঁ করছে কান, অফিসের মধ্যে বসে থাকতে লজ্জা হচ্ছে। উঠে বাথরুমে গিয়ে মুখে চোখে জল দিয়ে এল। টাইপরাইটারে চোখ চেপে আঙুল চালাচ্ছে চাবিতে।

টিফিনের সময়ে প্রায়ই আসে রাহুল, খানিক গল্পগুজব করে চলে যায়। আজও এল। নতুন একটা নাটকের মহলা চলছে, তারই অনুপুঙ্খ বিবরণ দিচ্ছে হাত পা নেড়ে। কিছুটা মুকাভিনয় আছে নাটকে, সেটা দেখাতে গিয়ে তাদের নির্দেশক কী কাণ্ড করেছে কাল, বলতে বলতে নিজেই হেসে খুন।

ভাস্বতী ভীষণ অন্যমনস্ক।

ভাবটা রাহুলের নজর এড়াল না। ভুরু কুঁচকে বলল,—শুনছ না যে ?

—শুনছি তো। ভাস্বতী অল্প চোয়াল ফাঁক করল।

—উঁহু, শুনছ না। শুনলে রিঅ্যাক্ট করতে।...নতুন কোন প্রবলেম হয়েছে নাকি ?

কথা বলতে ইচ্ছে করছে না ভাস্বতীর। বলল,—না, অল্প মাথা ধরেছে।

—চলো, চা খেয়ে আসি।

—নাহ্।

রাহুলের ভুরুতে ভাঁজ বাড়ল,—বুবলু মুনিয়া ঠিক আছে তো ?

ঠিক থাকা কাকে বলে সঠিক বুঝতে পারছে না ভাস্বতী। ছোট্ট করে ঘাড় নেড়ে দিল।

—তাহলে আর কি ! চলো চলো চলো, চা খেয়ে আসি। দেখবে মাথা বিলকুল সাফ হয়ে যাবে।

—আহ্ রাহুল। ভাল লাগছে না। তুমি যাও।

হঠাৎই বুঝি রুক্ষ হয়ে গেছে ভাস্বতীর গলা, রাহুল বিস্মিত চোখে ভাস্বতীকে দেখল একটুক্ষণ। লঘু স্বরে বলল, তোমার মর্জির তল পাওয়া ভার। একটু থেমে থেকে আবার বলল,—বুবলু মুনিয়ার তো ভেকেশান পড়ে গেছে, ছুটির পর আমার সঙ্গে এক জায়গায় যাবে ?

কোথায় জানারও উৎসাহ বোধ করল না ভাস্বতী। চুপ করে আছে।

রাহুল নিজে থেকেই বলল,—ম্যাক্সমুলারে। নর্থ বেঙ্গলের ফোকলোরের ওপর একটা দারুণ ডকুমেন্টারি আছে। চল্লিশ মিনিটের। সাতটা সাড়ে সাতটার মধ্যে পাইকপাড়া ফিরে যেতে পারবে।

ভাস্বতী শুনেও শুনল না। যেন সামনে রাহুল নেই এভাবে তাকাচ্ছে এদিক ওদিক।

রাহুল অনুনয়ের সুরে বলল,—চলো না ভাস্বতীদি, মন মেজাজ ফ্রেশ হয়ে যাবে।

—আমি কি বলেছি মনমেজাজ খারাপ আছে ?

—এত চটে যাচ্ছ কেন ? ইচ্ছে হচ্ছে না, যেও না। রাহুল উঠে পড়ল,—ভালর জন্যই বলছিলাম। ডকুমেন্টারিটা এবার ম্যানহাইম ফেসটিভালে যাচ্ছে।...

—আমার আজ একটু একা থাকতে ইচ্ছে করছে রাহুল।

ঈষৎ আহত মুখে রাহুল চলে গেল।

হাতের কাজ সেরে থমথমে মুখে বসে আছে ভাস্বতী। বড়বাবু মানুষটাকে সে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে, আজ কেন এমন বিশ্রী ব্যবহারটা করে ফেলল ? রাহুলের সঙ্গে ছবিটা দেখতে গেলে হয়তো মাথাটা হাল্কা হত, কেন রাজী হল না ? তবে কি তার মনের অতলে কোন এক গোপন স্রোতস্বিনী ক্ষইয়ে দিচ্ছে বাঁধ ? নিজের কাছে নিজেই বড় অচেনা এখন।

ছুটির পাঁচ দশ মিনিট আগে শিখার টেবিলে গেল ভাস্বতী।

শিখা ড্রয়ারে চাবি লাগাচ্ছিল। টেরচা চোখে তাকাল,—কিছু বলবি ?

পেপার ওয়েট নিয়ে নাড়াচাড়া করছে ভাস্বতী। মৃদু স্বরে বলল,—হুঁ।

শিখা ষষ্ঠেন্দ্রিয় দিয়ে কিছু বোধহয় আন্দাজ করল। এদিক ওদিক তাকিয়ে নিয়ে বলল,—এক সেকেন্ড। এখানে অনেক চোখ, অনেক কান, বাইরে গিয়ে কথা বলি চল্।

দুই নারী এসে দাঁড়িয়েছে প্যাসেজে, একটু কোণা ঘেঁষে।

—বল্, এবার মাথা ঠাণ্ডা করে বল্। কি বার্তা ?

—কি আর বার্তা ? ছোট্ট শ্বাস ফেলল ভাস্বতী,—কি করব ভেবে পাচ্ছি না। তুই একটু সাজেশান দে না।

—কিসের কি ?

—ছেলেমেয়ে দুটো বড় অধৈর্য হয়ে উঠেছে। মামার বাড়ি থাকতে চাইছে না।

শিখা এখন মোটামুটি জানে ঘটনাটা। অসীমা দীপ্তিদের অশোভন কৌতূহল পাছে স্ক্যান্ডালের পর্যায়ে চলে যায়, শিখাকে একদিন অনেকটাই বলেছে ভাস্বতী। অবশ্যই রেখে ঢেকে, রাহুলের প্রসঙ্গ যথাসম্ভব এড়িয়ে। রাহুলের সঙ্গে অল্পস্বল্প হাসিঠাট্টার সম্পর্ক আছে শিখার, ভাস্বতীর সুবাদেই। তবুও।

সমব্যথীর সুরে শিখা বলল,—পেটের সন্তানের কাছে মেয়েরা বড় অসহায়। এটা জানে বলেই পুরুষ মানুষরা জো পেয়ে যায়।

—ও আর শুনে লাভ কি ! কি করি বলবি তো ?

শিখা একটু চিন্তা করে বলল,—রণজয় তোর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল ?

ভাস্বতী দু দিকে ঘাড় নাড়ল। বলল,—একদিন বুবলু মুনিয়ার স্কুলে এসেছিল, আমার সঙ্গে দেখা হয় নি। তারপর থেকেই তো ওরা...

—বাবা বুঝি খুব জপিয়ে গেছে ?

—তাছাড়া কি।...বজ্জাত লোক...

—হুম্। শিখার চোখ সরু হল,—তুই কি চাস্ ?

—কি চাই মানে ? যা চাই সেটা বোঝানোর জন্যই তো চলে এসেছি।

—খেপে যাচ্ছিস কেন ? ঠাণ্ডা হ। মন যদি এত শক্তই আছে, তাহলে আমার কাছে এসেছিস কেন ?...দুমদাম চটাচটি করছিস্, মেজাজ দেখাচ্ছিস...

ভাস্বতী সামনের জানলা দিয়ে খোলা আকাশের দিকে তাকাল। আকাশ মানে বহুতল বাড়ির ফাঁকে ঝুলে থাকা এক টুকরো নীল। শেষ বিকেলের আলো মেখে নীলের গায়ে এখন রক্তিম আভা। কোন্টা সত্যি ? নীল, না লাল ? নাকি দুটোই মিথ্যে ? দুটোই অসীম শূন্যতা ? কোনটা পৃথিবীর মায়া মাখা, কোনটা সূর্যের।

শিখা নিম্ন স্বরে প্রশ্ন করল,—তুই কি রণজয়কে ভালবাসিস ? এখনও ?

ভাস্বতী দূরমনস্ক ভাবে বলল,—তাতে কার কি আসে যায় !

—অত প্যাঁচ করিস্ না। সোজাসুজি বল্, বাসিস কি বাসিস না ?

—ভালবাসি বলেই তো এতদিন অ্যাডজাস্ট করে ছিলাম।

—নো পাস্ট টেন্স। এখনকার কথা বল্ ?

কি উত্তর দেবে ভাস্বতী ? রণজয়ের অসুখ হয়েছিল শুনে বুকটা যে হঠাৎ হঠাৎ চিনচিন করে ওঠে, এ কি নিছকই সমবেদনা ? বিছানায় গাদাগাদি করে শুয়েও এক এক সময়ে বড় ফাঁকা ঠেকে শয্যা, এ কি নেহাতই অভ্যাস ? বাস স্টপে চমকে চমকে খোঁজে রণজয়কে,...

চোখের কোলে টলটল করে উঠল দু ফোঁটা মুক্তোদানা, আঙুল বুলিয়ে দ্রুত মুছে নিল ভাস্বতী।

শিখা হাত রেখেছে ভাস্বতীর কাঁধে। আলগা চাপ দিল,—শোন্ ভাস্বতী, তুই বরং ফিরেই যা।

—কেন যাব ? সে তো আমায় ডাকে নি ! তেতে উঠতে গিয়েও তেমন তীব্রতা ফুটল না ভাস্বতীর গলায় !

—তুই তাকে ভালবাসিস বলেই যাবি। সংসার ভাঙা খুব সহজ রে, গড়া কঠিন।

ভার বুকেও হাসি পেল ভাস্বতীর ! শিখা সুখী গৃহিণী স্বামী বুঝদার, ভাস্বতীর মতো কোন সমস্যার তাকে কখনও সম্মুখীন হতে হয় নি। সে কি করে বুঝবে, সংসার গড়া যত কঠিন, ভাঙা তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি

কঠিন। অস্তিত্বের কতখানি যে জুড়ে থাকে সংসার, ভাঙার সময়ই বুঝি তা টের পাওয়া যায়।

ভাস্বতী আত্মগত ভাবে বলল,—সংসার গড়তে, কি তাকে টিঁকিয়ে রাখতে অন্তত দুজন মানুষ লাগে। তার একজন যদি ক্রমাগত...

—আহ্, আমি কি জানি না! সে মানুষটাকে একটা শিক্ষা দিতে চেয়েছিলি, ঠিকই করেছিস। হয়তো এতে তার শিক্ষা হয়েছে। হয়তো মানুষটা বদলে গেছে।

এই কথাই তো নিজেকে মনে মনে বার বার বলতে চাইছে ভাস্বতী। বাইরের কেউ একজন সমর্থন করায় নিজের মনের কথার যেন জোর বেড়ে গেল সহসা।

শিখা ফিসফিস করে বলল,—সে'ও হয়তো মনে মনে পসতাচ্ছে! দম্ভে মরছে। নত হতে পারছে না বলে হয়তো আরও বেশি যন্ত্রণা পাচ্ছে। একজন না একজন কাউকে তো আগে এগোতেই হয়।

কথাগুলো শুনতে ভাল লাগছিল ভাস্বতীর। আবার কোথায় যেন একটা খচখচও করছিল। রণজয় বদলে যাবে? মানুষের স্বভাব কি বদলায়? ফিরে গেলে সে ঋতুপর্ণা বনে যাবে না তো?

তা কেন? ঋতুপর্ণা ঘরে পুষে রাখা আদুরে বেড়াল, তার পায়ের নীচে কোন মাটি নেই। সুখকে সে আত্মসর্বস্বতার নিরিখে বিচার করে। ভাস্বতী কখনই ঋতুপর্ণা নয়। সে লক্ষণের গণ্ডীর দুদিকেই পা রাখতে পারে।

বাড়ি ফিরে গা হাত পা ধুয়ে ছাদে এল ভাস্বতী। আকাশে আজ একটা বড় সড় চাঁদ উঠেছে। পূর্ণিমা নয়, তার কাছাকাছি কোন তিথি হবে। কানাভাঙা রূপোর পিরিচ মোহময় দ্যুতি ছড়াচ্ছে শহরে। টালা ট্যাংকের নীচের অন্ধকারটাকেও যেন আর তত গাঢ় লাগে না। এ কি বিভ্রম?

নরম একটা বাতাস বইছে। ভাস্বতীর শরীর জুড়িয়ে এল।

॥ নয় ॥

পরদিন অফিসে এসে রণজয়কে ফোন করল ভাস্বতী—তোমার সঙ্গে একটু দরকার ছিল। বিকেলে সময় হবে?

- কটায়?

—ধর পাঁচটা নাগাদ।

—আমি কি তোমার অফিসে যাব?

রণজয়ের স্বর ক্ষণকাল অনুভব করার চেষ্টা করল ভাস্বতী। আগ্রহই তো মনে হয়। একটু যেন নরম। হেরে গেল ভাস্বতী। নিজেই সে আগে রণজয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করল। আর কটা দিন অপেক্ষা করলে নিশ্চয়ই রণজয়ই...।

ভাস্বতী গলা ভারী করল—না, অফিসে আসার দরকার নেই। তুমি নিজাম প্যালেসের গেটে থেকো। আমি চলে আসব।

ছুটির আগে টয়লেটে গিয়ে চুলে একটু চিরুনি চালাল ভাস্বতী। দু এক সেকেন্ড নিষ্পলক নিজেকে দেখল আয়নায়। এই কদিনেই চোখের তলায় কালি পড়ে গেছে, কণ্ঠার হাড় দুটোও যেন প্রকট হয়েছে একটু। মন বড় তাড়াতাড়ি ছাপ ফেলে শরীরে। মন, নাকি ক্লান্তি? বেসিন খুলে মুখে চোখে জলের ঝাপটা দিল ভাস্বতী, যদি ক্লান্তির ছাপ মোছে। ব্যাগ থেকে লিপস্টিক বার করে আলতো বুলোল ঠোঁটে। সতর্ক, যেন চড়া না হয়ে যায়। ছোট কাজলের পেনসিল ব্যাগেই রাখা থাকে, সন্তর্পণে টানছে আঁখি পল্লবে। কৃত্রিম কালো রেখায় বুঝি আবছা হল চোখের গাঢ় আঁধার।

সময় বুঝে অসীমা আর দীপ্তিও এসেছে টয়লেটে। দীপ্তির বাহুমূলে চিমটি কেটে অসীমা ভালমানুষের মতো বলল—এত সাজছ কেন গো ভাস্বতীদি? কোথাও যাবে?

—হুঁ

—বিয়ে বাড়ি?

মিটিমিটি হেসে মাথা দোলাল ভাস্বতী—সিনেমায় যাব। বরের সঙ্গে।

—ওমা তাই! তোমাদের সব মিটে গেছে?

ভাস্বতী উত্তর দিল না। ছোট্ট একটা হাসি ছুড়ে দিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে।

ইচ্ছে হলে অসীমা আসুক পিছু পিছু, দেখে যাক।

লিফটের সামনে এসেও ভাস্বতী দাঁড়িয়ে রইল একটুক্ষণ। সবে পাঁচটা তিন, নিজাম প্যালেস মাত্র মিনিট দুয়েকের পথ, এত তাড়াতাড়ি চলে যাবে ? না, কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকুক রণজয়। মন্থর পায়ে সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে নামল ভাস্বতী। মেন গেট পার হয়ে কয়েক পা গেলে সামনে একটা ছোট্ট নিলাম ঘর, ভেতরে থরে থরে সাজানো রয়েছে চিনে মাটির পুতুল, অতিকায় ফুলদানি, বাহারী ঝাড়লণ্ঠন, কারুকাজ করা কাচের বাসন। ভাস্বতীর ড্রয়িংরুমের ক্যাবিনেটটা ফাঁকা রয়ে গেছে, ভরাতে হবে। বুবলু মুনিয়ার ঘরে ওই ছোট্ট কাটগ্লাসের টেবিল ল্যাম্পটা রাখলে কেমন হয় ? উঁহু ভেঙে ফেলবে। বরং নিজেদের বিছানার পাশেই...

নিজাম প্যালেসের সামনেটা বেশ ভিড় ভিড়। ভাস্বতী আলগা ঘড়ি দেখে নিল। পাঁচটা পঁচিশ। বেশি দেরি হয়ে গেল কি ? চঞ্চল চোখে তাকাল এদিক ওদিক। রণজয় নেই। ফিরে গেল ? দু চার পা সামনে হাঁটল ভাস্বতী, রাস্তার উল্টো পারে চোখ চালাল। নেই রণজয়।

দু-চার মিনিট যেন-দু-চার ঘন্টা। প্রতীক্ষার অপমানে কান গরম হয়ে উঠছে ভাস্বতীর। মেট্রো স্টেশনের দিকে এগোবে কিনা ভাবছে, যেচে ফোন করার জন্য আফসোসও হচ্ছে, তখনই হঠাৎ পাশে এসে দাঁড়াল রণজয়,— কতক্ষণ ?

নিমেষে নিজেকে সামলে নিল ভাস্বতী,— এই তো।

—অফিস থেকে বেরোতে আমার একটু দেরি হয়ে গেল।

—ও।

রণজয় অন্য দিকে তাকাল,— বলো কী বলবে।

বাস স্টপে একটা ভিড় মিনিবাস এসে দাঁড়িয়েছে। হু হু করে লোক ওঠার চেষ্টা করছে। এক বৃদ্ধ মানুষ নামতে চাইছেন, পারছেন না, ধস্তাধস্তি গুঁতোগুঁতি চলছে ভীষণ। সেদিকে কয়েক পল তাকিয়ে থেকে ভাস্বতী বলল, এখানে দাঁড়িয়েই শুনবে ?

—তবে চলো কোথাও বসি।

হাত পঞ্চাশেক দূরে একটা ছোট রেস্টুরেন্ট। মেয়েরাই পরিবেশন করে। একটু বদনাম আছে জায়গাটার। অনেক আগে রণজয়ের সঙ্গে এক আধবার ভাস্বতী ঢুকেছে রেস্টুরেন্টটায়, পরিবেশটা তার একদম পছন্দ নয়। ঘুপচি মতন। কেমন যেন অন্ধকার অন্ধকার।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও আজ ভাস্বতী কিছু বলল না, রণজয়ের পিছন পিছন এসে বসল। কেবিনে। পর্দা টেনে দিয়ে।



রণজয় হেলান দিয়ে বসেছে,—খাবে কিছু ?
—চা বলো।
—শুধু চা কেন খাবে ? অফিস থেকে বেরোলে !
কেবিনের পর্দা সরিয়ে একটা ক্ষয়াটেমুখ মেয়ে উঁকি দিয়েছে।
—দুটো ফ্রাই দেখি। ...তারপর দুটো চা। একটা চিনি ছাড়া।
মেয়েটার মুখ সরে গেল।
ভাস্বতী টেবিলে ঝুঁকল সামান্য —চায়ে চিনি ছেড়ে দিলে !
—ডাক্তার বারণ করেছে।
—হঠাৎ ?
—একদিন রাস্তায় মাথা ঘুরে গেছিল। ডাক্তার সুগার টেস্ট করতে বলল...
—কত হয়েছে ? উদ্বেগটা চাপতে পারল না ভাস্বতী।

তিনশো সত্তর। টু উইকস্ বেড রেস্টে ছিলাম। বলেই মাথার ওপর ঢকঢক করে ঘুরন্ত পাখার দিকে তাকাল রণজয়—ডায়েট রেস্ট্রিক্টেড্ হয়ে গেছে।

—তবে ফ্রাই খাচ্ছ যে?

—ওতে বারণ নেই। ওই আলু ফালু, কার্বোহাইড্রেট...

—আসল জিনিসটা ছেড়েছ?

কথাটা যেন শুনলই না রণজয়। নোংরা নুনের কৌটোটা হাতে তুলে ঘোরাল কাজের কথা বলো।

ভাস্বতী এক দৃষ্টে রণজয়কে দেখছিল। চেহারাটা সত্যিই বেশ খারাপ হয়েছে। কপালে একটা দুটো ভাঁজও দেখা দিয়েছে যেন। গালের হনু ঠেলে উঠেছে। জ্বলজ্বলে চোখ নিষ্প্রভ, দ্যুতিহীন।

রণজয় আবার বলল—বলো, কী জন্য ডেকেছিলে?

কীভাবে কথা শুরু করবে ভেবে পাচ্ছিল না ভাস্বতী। রণজয়ই বা নিজে থেকে কেন কিছু বলছে না! বলতে তো পারে, অনেক হয়েছে, এবার বাড়ি চলো স্বাতী! ভাস্বতীর যেন আবছা মনে পড়ল রাহুলকে সে বলেছিল ডিসিশানের কোনও মাঝামাঝি নেই, আজ ঠিক এই মুহূর্তে তার এ কী দশা।

গলা ঝেড়ে ভাস্বতী বলল— ছেলেমেয়ে দুটোর কথা কিছু ভেবেছ?

রণজয়ের চোখ নুনের কৌটোয়—আমি ভাবার কে! তুমি তো একাই সব ভাবছ।

—হুঁ, তা ভাবছি। ভাস্বতী একটু হাসার চেষ্টা করল। মেয়েটা টেবিলে দু গ্লাস জল দিয়ে গেছে। পুরো জল ঢকঢক শেষ করে বলল—দ্যাখো, রাগের মাথায় মানুষ অনেক কথা বলে। তুমিও বলেছ। অনেক অন্যায় কথাও বলেছ।

—হ্যাঁ, তোমার গায়ে হাত তোলা আমার উচিত হয়নি। আই অ্যাম সরি।

ভাস্বতী আবার একটু সময় নিয়ে বলল—ছেলেমেয়ে দুটো কষ্ট পাচ্ছে। ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে...

—ও। তার মানে তুমি ছেলেমেয়ের কথা ভেবে আমার কাছে এসেছ?

ভাস্বতীর কোমলতাকে কি দুর্বলতা ভাবছে রণজয়?

ভাস্বতী নিরস স্বরে বলল—কিছুটা তো বটেই। আমাদের সম্পর্ক তো শুধু এখন আমাদের দু'জনের নয়, ওরাও আমাদের মধ্যে বিলঙ্ করে।

—অত যদি বোঝ, ওদের নিয়ে গেছ কোন আক্কেলে? রণজয়ের গলা সামান্য চড়েছে।

—কেন নিয়ে গিয়েছিলাম মনে নেই? ভাস্বতীরও ধৈর্যচ্যুতি ঘটছে—আয়নায় তখন নিজের মুখটা দেখেছিলে?

—আমি দেখব কেন? তুমি একলাই দেখেছিলে। তোমার আয়না আছে, আমার নেই।

তীক্ষ্ণ চোখে তাকাতে গিয়েও মাথা নামিয়ে নিল ভাস্বতী। ফিশ ফ্রাই এসে

গেছে। মেয়েটি মাথা সরাতে গিয়েও থামল—ব্রেড দেব?

—দিতে বলেছি? রণজয় প্রায় খেঁকিয়ে উঠল।

পর্দা আবার টানটান। ফিশ ফ্রাইতে চেপে চেপে ছুরি ঘষছে রণজয়, ফালা ফালা করছে টুকরোগুলোকে। একটা টুকরো কাঁটায় গেঁথেও মুখে তুলল না। চোখ টেরিয়ে জিজ্ঞাসা করল—তোমার রাহুল আজ অফিসে আসেনি?

—এসেছে নিশ্চয়ই। আমার সঙ্গে দেখা হয়নি।

—রাহুল ছাড়াও তুমি তাহলে একা একা ঘুরতে পারো!

ভাস্বতীর শরীরের তাপ বাড়ছিল। মাথার পিছনটা দপ দপ।

—শোন, একটা কথা বলছি পরিষ্কার শুনে নাও। রণজয় কাঁটা চামচ নামিয়ে রাখল—আই অ্যাম সরি ফর দা ইন্‌সিডেন্ট হ্যাপেনড দ্যাট নাইট। তুমি ইচ্ছে করলে ফিরে আসতে পার, আই শ্যাল ওয়েলকাম ইউ। তবে ফিরতে চাইলে শুধু ছেলেমেয়ের কথা ভেবে নয়, আমার কথা ভেবেই ফিরতে হবে। তার জন্য তুমি যদি আমাদের মধ্যে কিছু বোঝাপড়া চাও, আমি রাজি। আর সেরকম হলে আমাকেও কিছু ছাড়তে হবে...তোমাকেও...। ছাড়ব। আমি আর ড্রিঙ্কস ছোঁব না, তোমাদের জন্য আরও বেশি সময় দেব। ...তোমাকেও সমস্ত রকম আজে বাজে সংসর্গ ত্যাগ করতে হবে। ইয়েস। তোমার রাহুলকেও।

দুর্মর ক্রোধে, ক্ষোভে, ঘৃণায় ভাস্বতী অদ্ভুত রকম শীতল হয়ে গেল। তর্ক করারও প্রবৃত্তি হচ্ছে না, গলা বুজে আসছে। এই সেই মানুষ যার ক্ষণিক অদর্শনও এক সময়ে যেন অসহ্য মনে হত! দুটো দিন বাপের বাড়ি কাটাতে হলে গোটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড শূন্য শূন্য ঠেকত! সে এমন কিছু অসামান্য রূপসী-নয়, তবু তার মতো এক সাদামাটা মেয়ের বিরহে ওই পুরুষ সারা রাত বিছানায় ছটফট করছে, এই ভাবনাটাই যে কী মোহময় ছিল তখন! মনে হত সে যেন অসম্পূর্ণ ছিল, রণজয় এসে তাকে পূর্ণ করেছে! ওই রণজয়, দর কষাকষি করা রণজয়!

ভুল ভুল, আদ্যোপান্ত ভুল ধারণা। কে কাকে সম্পূর্ণতা দিতে পারে পৃথিবীতে! প্রতিটি মানুষেরই মনের ভেতরে আরও একটা মন থাকে। গভীর গোপন। শক্ত খোলসে ঢাকা। ওই মনটাকে ভেদ করার ক্ষমতা কারুর নেই। সম্ভবত যার মন, তারও না।

ভাস্বতী কোনক্রমে বলতে পারল,- তুমি বোঝাপড়া চাও, না চুক্তি চাইছ?

—অত কায়দার বাংলা-টাংলা আমি জানি না। তোমার নাটুকে রাহুল জানে। আমি যা চাই তা স্পষ্ট বলে দিলাম।

ভাস্বতী দাঁতে দাঁত ঘষল—তুমি শোধরানোর লোক নও। তোমার সঙ্গে কথা বলতে আসাটাই আমার ভুল হয়েছে।

—তাই। তাই। রণজয় খাবার প্লেট ঠেলে সরিয়ে দিল।

—আমি চলি। ভাস্বতীও উঠে দাঁড়িয়েছে। অপরিচ্ছন্ন কেবিনের ময়লা পর্দা টেনে সরিয়ে বেরিয়ে আসছে হনহন।

পিছন থেকে রণজয়ের গলা ঝাপটে এল,—আমার কথা শুনলে ভাল করতে। এর পর আর পথে দাঁড়ানোরও জায়গা হবে না।

ক্লিষ্ট ভাস্বতী মেট্রোয় ফিরছে। কামরা আলোয় আলোময়, লোকে টইটুম্বুর, কোলাহলে সরগরম। ভাস্বতী শুধু একা। একদম একা।

নিজেকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারছিল না ভাস্বতী। সে আজ অভিসারিকা সেজেছিল, রণজয় তাকে দেখলই না!

॥ দশ ॥

রাতে খাওয়া দাওয়ার পর ভাস্কর বলল—বুলু, তুই একটু আসবি ? তোর সঙ্গে একটা জরুরি আলোচনা ছিল।

ভাস্বতী ছেলেমেয়ের হোম-টাস্ক নিয়ে বসবে ভাবছিল। গরমের ছুটি প্রায় পার হয়ে এল, এখনও বুবলু অঙ্কই শুরু করেনি। মুনিয়ারও হ্যান্ডরাইটিংয়ের অনেক লেসন আছে, ধরে বেঁধে না বসালে বইয়ের পাতাটি উল্টোচ্ছে না। এ পাড়ায় কয়েকটা বন্ধু হয়ে গেছে বুবলু মুনিয়ার, দিন রাত তাদের সঙ্গে খেলা আর খেলা।

দাদার ডাকটা কানে লাগল ভাস্বতীর। একটু যেন চিন্তিত লাগছে দাদাকে ! ভাস্কর ফিরলেই সন্ধ্যে থেকে বাড়ি গমগম করে, আজ যেন একটু ম্রিয়মান ! খাওয়ার সময়েও কথা বলছিল না !

ভাস্বতী বুবলু মুনিয়ার সামনে থেকে উঠে এল। সামান্য উদ্বিগ্ন মুখে বলল,—কী হয়েছে রে দাদা ?

—তেমন কিছু নয়। আয় না, ছাদে আয়।

শেষ জ্যৈষ্ঠের ছাদ, সারাদিনের রোদ শুষে এখনও তপ্ত। তেমন হাওয়া নেই, অল্প গুমোট ভাব। আকাশে অনেক তারা, চাঁদ নেই।

আলসেতে হেলান দিয়ে ভাস্কর বলল—ক'দিন ধরেই তোকে একটা কথা বলব ভাবছি। ...তুই কি ঠিক করলি ?

—কি ব্যাপারে বল তো ?

—তোর ছেলেমেয়ের ব্যাপারে। তোর ব্যাপারে। ...এভাবে তো অনন্তকাল চলতে পারে না।

—অসুবিধের কথা বলছিস ? ওই ছুটোছুটি ? ভাস্বতী আলসে ধরে সামান্য ঝুঁকল—ও আস্তে আস্তে অভ্যেস হয়ে যাবে। আরও কত দূর দূর থেকে ছেলেমেয়েরা স্কুলে আসে। সল্টলেক...সোনারপুর...

—তাদের উপায় নেই বলে আসে। বাবা মা দূরে থাকে বলে আসে।

—আমিও দূরে থাকি।

—উপমাটা ঠিক হল না বুলু। তাদের বাচ্চাদের ঘন্টার পর ঘন্টা বসে

থাকতে হয় না। জানিস, এতে বাচ্চাদের ওপর কত মেন্টাল স্ট্রেন পড়ে? একটা ফিলিং অব ইনসিকিউরিটি গ্রো করে? ধর তুই হয়তো স্কুলে ঠিক সময়ে পৌঁছতে পারলি না, পথে কোথাও গন্ডগোল হল...শহরে তো হয়ই, নাকি?

—ক্লাস আরম্ভ হয়ে গেছে, একটা বছর আর কষ্ট করুক। নেক্সট ইয়ার এদিকে কোথাও ভর্তি করে দেব।

—এটাও যুক্তির কথা হল না।

ভাস্বতী অসহায় মুখে তাকাল,—আর কী করতে পারি দাদা?

—সিম্পল সলিউশনটা কেন যে তোর মাথায় আসছে না!

এতক্ষণে যেন দাদার ডাকার উদ্দেশ্যটা স্বচ্ছ হচ্ছে। এই ক' মাস ধরে ক্রমশ যে ভারী বাতাবরণ তৈরী হয়েছে বাড়িতে, অপ্রত্যক্ষ চাপ গড়ে তুলছে বউদি মা, দাদার স্বরেও যেন তারই প্রতিধ্বনি। রণজয়ের সঙ্গে সে দেখা করেছে, তাদের মিটমাটের আশু কোনও সম্ভাবনা নেই, এ কথা কি বলবে দাদাকে?

ভাস্কর ঝপ করে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। বিনা প্রস্তুতিতেই বলে উঠল—রণজয় আজ আমার অফিসে এসেছিল।

ভাস্বতী হকচকিয়ে গেল। মনে মনে ধন্যবাদ দিল অন্ধকারকে, দাদা তার চমকটুকু ঠাহর করতে পারেনি। স্বর যথাসম্ভব নির্লিপ্ত রেখে বলল—তো?

—আমি তাকে লেফট অ্যান্ড রাইট ঝেড়েছি। আমার বোনকে হিউমিলিয়েট করে সে পার পেয়ে যাবে...অসম্ভব, ভাস্কর বোস সে ধাতুতে গড়া নয়। ঝাড় খেয়ে রণজয় কেঁউ কেঁউ করছিল, আমার কাছে ক্ষমা চেয়েছে। ভাস্কর ঠোঁটে সিগারেট চাপল,—কিন্তু তোমারও তো কিছু দোষ আছে বুলু। ও যা কমপ্লেন করে গেল তার পাঁচ পারসেন্টও যদি সত্যি হয়...

—কী বলেছে?

—ও সেই রাহুলের কথাই বলছিল। কবে অ্যাকাডেমিতে গেছ, কবে নন্দনে গেছ...তুই নাকি এখানে আসার পরও ছেলেটাকে নিয়ে তোর ফ্ল্যাটে গিয়েছিলি? ফাঁকা ফ্ল্যাটে দু'জনে এক ঘন্টা ছিলি?

—তুই ওর কথা বিশ্বাস করলি দাদা?

—যাস্‌নি তুই?

—অবশ্যই গিয়েছিলাম। টুকিটাকি কিছু জিনিসপত্র আনার ছিল...রাহুল আমাদের ফ্ল্যাটে ঢোকেওনি।

—তুই নিজে মুখে যা বলবি, আমি তাই বিশ্বাস করব। ভাস্করের গলায় প্রচ্ছন্ন অবিশ্বাস। সিগারেট ধরিয়ে কাঠির আগুনটাকে দেখছে...ফুঁ দিয়ে নেবাল। ক্ষণিক আলোকিত মুখ আবার অন্ধকার।

সিগারেটে ঘন ঘন দু'তিনটে টান দিয়ে ভাস্কর বলল,—কিন্তু বুদ্ধিমতী মেয়ে হিসেবে তোমার কী কর্তব্য জানো ? আদৌ এ ধরনের কথা না উঠতে দেওয়া। তুমি কি একথা অস্বীকার করতে পারো রণজয় তোমাকে ভালবাসে ? ...হ্যাঁ, আমি মানি রণজয় একটু বেশি পজেসিভ। সেটা কখনও কখনও শিষ্টতা শালীনতার মাত্রা ছাড়ায়। তবু তোমাদের মধ্যে একটা যখন সম্পর্ক রয়েইছে, এবং সেটা কম দিনের নয়, এগারো বছরের...এগারো বছর খুব কম সময় নয় বুলু। মোর দ্যান এ ডিকেড। এখন তো পরস্পরের পছন্দ অপছন্দকে খানিকটা মূল্য দিতেই হবে।

ভাস্বতী নীরব। বলতে গেলে অনেক কথা বলতে হয়। এগারো বছর মানুষের সহ্যশক্তি পরীক্ষা করার জন্যও অনেক দীর্ঘ সময়। এত দিনেও তার সহ্যের বাঁধ ভাঙবে না, এতটা জড় বস্তু সে হবে কী করে ! রুচিতে ভাবনায় সে আর রণজয় যে সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর মানুষ ! সুন্দর ছবি দেখে আনন্দ পায় না রণজয়, ভাল নাটক দেখতে গেলে তার হাই ওঠে, সেতার সরোদের বাজনা পিড়িং পিড়িং মনে হয়, সেলুলয়েডে প্রমত্ত মারপিট না থাকলে সে সিনেমা দেখে না, গল্পের বই তার দু'চক্ষের বিষ, এ সব বুঝেও তো ভাস্বতী রণজয়ের সঙ্গে থেকেছে এগারোটা বছর। অফিস আড্ডা আর ওই নোংরা সন্দেহ বাতিক—এটুকুই রণজয়ের ত্রিভুবন। সংসার আর চাকরির ঘানিতে ঘুরতে ঘুরতে এক চিলতে নীল আকাশ দেখতে চাওয়াটা কি ভাস্বতীর এতই অপরাধ ? সমাজনীতি কি তাই বলে ?

ভাস্বতী এসব কোনও কথাতেই গেল না। স্পষ্ট গলায় জিজ্ঞাসা করল—একটা সত্যি কথা বল তো দাদা। আমি এখানে থাকলে কি তোদের অসুবিধে হচ্ছে ?

একটু যেন অস্বস্তিতে পড়ল ভাস্কর। বুঝি বা নিজেরই আশ্বাসবাণী মনে পড়ে গেল। হালকা গলায় বলল,—আমি কি সে কথা বলছি ? তাছাড়া এটা তো তোরও বাড়ি। তুই এখানে থাকতে চাইলে আমার কী বলার আছে ?

ভাস্বতীর গলা ধরে এল। তার বলতে ইচ্ছে করছিল মেয়েদের কোথাও ঘর থাকে না রে দাদা। যা থাকে তা হল আশ্রয়। বিয়ের আগেও। পরেও। ছেড়ে যাওয়া আশ্রয়ে ফিরতে চাইলেই কি ফেরা যায় ! কোথাও কোনও অধিকার ফলাতে গেলেই সংঘাত অনিবার্য। আজ যদি ভাস্বতী দাদাকে বলে, বাড়ির একতলাটা তো কোম্পানিকে ভাড়া দিয়ে রেখেছিস, ওদের নোটিস দিয়ে উঠিয়ে দে, আমি একতলায় ছেলেমেয়ে নিয়ে শান্তিতে থাকি, দাদা কি ড্যাং ড্যাং করে নাচবে ? বলবে না কোন মুখে বাড়ির ভাগ চাইছিস বুলু ? মনে রাখিস তোর বিয়েতে দেড় লাখ টাকা খরচা হয়েছিল ! ভদ্রতা বশে না বললেও

মনে মনে বলবে, ভাই বোনের সম্পর্কে সূক্ষ্ম চিড় ধরে যাবে একটা।

ভাস্বতী খুব নীচু স্বরে বলল—আমাকে একটু ভাবতে দে দাদা।

—ভাবো না। টেক ইওর টাইম। তোরা তো আর জলে পড়ে নেই। ...মামার বাড়িতে থেকে কি বাচ্চারা মানুষ হয় না? অনেক হয়। ...আমার শুধু ভাবতে খারাপ লাগছে তোকে হয়তো অনেক টিকাটিপ্পনী শুনতে হবে। বুঝিসই তো সবাই এসব ঘটনা সোজা চোখে দেখে না। বলতে বলতে গলা নামাল ভাস্কর। সিঁড়ির দিকেও এক ঝলক তাকিয়ে নিল—এই তো তোর বউদি বলছিল তার বাপের বাড়ির লোকেরা নানা রকম প্রশ্ন করছে। ফালতু কৌতূহল, কোনও অর্থ হয় না, তবু তোর বউদির মানে লাগে। আমাকেও তো সেদিন পল্টুদা মোড়ে ধরল। তোর সম্পর্কে...যাক গে ছাড়। লোকের মুখ আছে, বলবে। তুই ভাব। তবে আমার মনে হয় রণজয়কে তুই আরেকটা চান্স দিতেই পারিস। না হয় ওই ছেলেটার সঙ্গে মেশামিশি না'ই করলি...

—তাহলে কি মিথ্যেটা সত্যি হয়ে যাবে না দাদা?

—কোন্‌টা সত্যি, কোন্‌টা মিথ্যে কে তার হিসেব রাখে বুলু?

—মানে?

—মানে...আমি বলতে চাইছি...ভাস্কর আমতা আমতা করছে,—রণজয়ের সন্দেহটা ভুল হতে পারে, কিন্তু ঘটনাটা তো সত্যি।...আই মিন, রণজয়ের মনের কাঁটাটা তো সত্যি। তুই সেটাকে ইনডালজ্ করবি কেন? যে কোন সেন্সেবল্ স্ত্রীর উচিত স্বামীর মনের কাঁটা উপড়ে ফেলা।

—উচিতটা শুধু স্ত্রীরই? স্বামীর কোন দায় নেই? সে তার স্ত্রীকে বোঝার চেষ্টা করবে না?

—অবুঝ লোক তো থাকে বুলু। তাদের নিয়েও তো মেয়েরা ঘর করে। ছাড়তে হয়...একটু জমি ছাড়তে হয়। সেও তো কিছু কিছু বদভ্যেস ছাড়বে বলেছে। ড্রিঙ্ক করবে না, সংসারের দিকে মনে দেবে...

—ওগুলো তো বাইরের অভ্যেস রে দাদা। ওসব মেনে নেওয়া যায়, মানিয়ে নেওয়া যায়। হয়তো অনেক অসুবিধে হয়, রাগ হয়, ঝগড়াঝাঁটি হয়, তবুও। কিন্তু ভেতরে গেঁড়ে বসা অবিশ্বাসটা...বিয়ের এগারো বছর পরে...এ যে কী অপমান তুই ফিল্ করতে পারবি না দাদা। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক যে ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে সেটাই যদি নড়বড়ে হয়ে যায়...

—তুই বড় জেদী বুলু। ভাস্করের স্বর তেতো হয়ে গেল। কেটে কেটে বলল,—তুই নিজেই এক ইঞ্চিও জমি ছাড়তে রাজি নোস্।...শুধুমুদু একটা থার্ড পার্টির জন্য...সেই রাহুল ছেলেটাই বা কী! সে জানে তোদের সিচুয়েশান কি, তার পরও...আমার ভাল্ লাগছে না বুলু।

ভাস্বতীরও আর শুনতে ভাল লাগছিল না। ধীর পায়ে নেমে এল। বুবলু মুনিয়া মেঝেতেই ঘুমিয়ে পড়েছে। মা খাটে চোখ বুজে শুয়ে। বউদির ঘরে টিভি চলছে, মা ছেলে কোনও সিরিয়াল দেখছে বোধহয়।

ছেলেকে টেনে তুলতে চেষ্টা করল ভাস্বতী। উঠছে না। আলো নিবিয়ে নিজেই শুয়ে পড়ল মাটিতে। ছেলেমেয়ের মাঝখানে। এক হাতে বুবলুকে ছুঁয়ে আছে, অন্য হাতে মুনিয়াকে।

বন্ধ চোখে হিমানীর ডাক শুনতে পেল ভাস্বতী,—ওখানে শুলি কেন বুলু ? ওপরে আয়।

—নাহ্, এখানেই ভাল আছি। ভাস্বতী হাই তুলল—তোমার শরীর খারাপ, তুমি ঘুমোও।

হিমানী একটুক্ষণ চুপ। আবার গলা বাজছে—নন্দর সঙ্গে কী কথা হল ?

—কিছু না। এমনি কথা।

—নীলু কি জামাইয়ের কাছে গিয়েছিল ?

—না। ভাস্বতী আধা সত্যি বলে মাকে এড়াল,—দাদা যায়নি।

—যদি রাগ না করিস তো একটা কথা বলি ? জামাইকে একবার ডাকবি এ বাড়িতে ? তোকে থাকতে হবে না, আমিই তার সঙ্গে...একটু বুঝিয়ে দেখতাম।

—নিজেই ডেকে পাঠিও। দাদার কাছে ফোন নাম্বার আছে...

—এই দ্যাখো, তুই রাগ করলি। মেয়েমানুষ হওয়ার বড় জ্বালা রে বুলু। যতই খারাপ লাগুক, গায়ে একটা তকমা লাগিয়ে রাখতেই হয়। এ সংসারে একা মেয়েমানুষের বেঁচে থাকা বড় কঠিন। বর না থাকলেও কঠিন। বর থাকলে আরও বেশি কঠিন। সে তুই রোজগেরে মেয়েই হোস কী ছাই আমাদের মতো...। এখনও এই সমাজটা বড় বেআক্কেলে রে।

ভাস্বতী জবাব দিল না।

হিমানীর গলা আবার কাঁপছে—শুনছিস বুলু ? তোর জন্য আমার বড় চিন্তা হয়। ছেলেরা যত অপরাধই করুক, লোকে তা চিরকাল মনে রাখে না। যেটুকু মনে রাখে তা হল, মেয়েটা বরের ঘর করতে পারল না। আরও মুশকিল কী জানিস ? স্বামী ছাড়লেই মেয়েরা একদম বেওয়ারিশ। সবাই লুব্ধিস্টি চোখে দেখে। শেয়াল কুকুরে ছেঁকে ধরে।

হিমানীর স্বরে ঘর আরও অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে।

গাঢ় তমসা লক্ষমুখ বর্শা হয়ে বিঁধছিল ভাস্বতীর দু'চোখের পাতায়। কাঁদতে চাইছিল ভাস্বতী। চোখ শুকনো, খরখরে। মরুভূমির মতো।

॥ এগারো ॥

বর্ষা এল, চলেও গেল। এবার তেমন বৃষ্টি হল না। আকাশ মাঝে মাঝেই ঘনঘোর সাজে সেজে ওঠে, কিন্তু এক দু' ঘণ্টা টিপটিপ করেই কোথায় যেন চলে যায় বাদুলে মেঘেরা। কলকাতা শহরে এবার একদিনও জল জমল না, ভাবা যায়!

বুবলু মুনিয়ার ফার্স্ট টার্ম পরীক্ষা হয়ে গেছে। রণজয় এখন মাঝে মাঝেই তাদের স্কুলে আসে। মুখ তার সর্বদাই বিরস, ভাস্বতীর সঙ্গে নিতান্ত দায় না পড়লে কথা বলে না। যেটুকুও বলে কাটা কাটা, প্রাণহীন। যেন খুব অপছন্দেরও কোনও আধা পরিচিতের সঙ্গে জোর করে কথা বলছে। বুবলু মুনিয়ার সামনে দৃশ্যটা যথেষ্ট দৃষ্টিকটু, ভাস্বতী চায় না তাদের সম্পর্কের ছায়া ছেলেমেয়ের ওপর পড়ুক, অন্তত সরাসরি। কিন্তু রণজয়ের তাতে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই, ভাস্বতীকে প্রতি পলে অপমান করাই যেন এখন তার জীবনের একমাত্র ব্রত।

কদিন দেখে ভাস্বতী পাল্টা আক্রমণের রাস্তা বেছে নিয়েছে। প্রায়শই সঙ্গে নিয়ে আসে রাহুলকে, যতক্ষণ ছেলেমেয়ের সামনে রণজয় দুঃখী বাবার অভিনয় করে, ততক্ষণ দশ পা তফাতে দাঁড়িয়ে রাহুলের সঙ্গে গল্প করে ভাস্বতী। স্পষ্ট টের পায় রণজয় জ্বলছে। জ্বলুক। এই জ্বলনই তার পাওনা। রাহুল প্রথম প্রথম রণজয়ের সামনে কাঁটা হয়ে থাকতে। কোন্ পুরুষই বা নারীর হাতে ক্রীড়নক হতে চায়? হোক না সে তার ছোট ভাই-এর মতো। ক্রমে তারও বুঝি সয়ে গেল অনেকটা। বুঝি বা এক পুরুষ ঈর্ষার আগুনে পুড়ছে, এ দেখে অন্য পুরুষের অহং তৃপ্ত হয়। হোক না সে ছোট ভাইয়ের মতো।

বুবলু মুনিয়ার রেজাল্ট বেরোনোর দিন আচমকা এক প্রস্তাব আনল রণজয়। ঝির ঝির বৃষ্টি পড়ছিল সেদিন। বুবলু মুনিয়ার স্কুলের গেটে প্রকাণ্ড এক পিপুল গাছ, তার নীচে ছাতা মাথায় দাঁড়িয়ে ছিল ভাস্বতী, রাহুল সেদিন আসেনি।

দারোয়ানের ঘরের সামনে দাঁড়ানো ছেলেমেয়ের হাতে দুটো প্যাটিজ

ধরিয়ে দিয়ে ভাস্বতীর সামনে এসে দাঁড়াল রণজয়। বিনা ভূমিকায় বলে উঠল—আমি বুবলু মুনিয়াকে নিয়ে যেতে চাই।

ভাস্বতীর মাথায় বাজ পড়ল—সেকি! তা কী করে হয়!

—আমার ছেলেমেয়েকে আমি নিয়ে যাব তাতে ভাবাভাবির কী আছে?

ভাস্বতী একটু কুঁকড়ে গেল। অধিকার তো রণজয়ের আছেই। ছেলেমেয়েকে সরিয়ে নিয়ে তাকে জব্দ করতে চায় রণজয়? তা কিছুতেই হতে দেবে না ভাস্বতী। দরকার হলে চেঁচামেচি করবে, সিন্ ক্রিয়েট করবে।

রণজয়ের ঠোঁটে বাঁকা হাসি—বুবলু মুনিয়াই কিন্তু আমার কাছে যেতে চায়। কারণ, সম্ভবত আমি ওদের বাবা। অন্তত ওরা তাই জানে।

কী ভাষা!

রাগে গলা দিয়ে স্বর ফুটল না ভাস্বতীর।

ছেলেমেয়ে নিয়ে রণজয় চলে গেল।

ভাস্বতী স্তব্ধ। স্তম্ভিত। বুক ফেটে যাচ্ছে। চোখ ভেসে যায় বার বার। বুবলু মুনিয়া নাচতে নাচতে চলে গেল! বাবার ওপর এত টান! ভাস্বতীর দিকে ফিরেও তাকাল না!

সারাটা রাত ভাস্বতী দু' চোখের পাতা এক করতে পারল না। বাড়িতে কারুর একটুও কষ্ট হল না ভাস্বতীর জন্য! দাদার না, বউদির না, মা যে মা তারও নয়! ভাস্বতীর বিধ্বস্ত রূপ দেখেও সবাই খোয়াবে মশগুল, বরফ নাকি এবার গলছে!

মাথা মুড়িয়ে ভাস্বতীকে তবে ফিরতেই হবে ওই একগুঁয়ে বেতমিজ লোকটার কাছে! হেরে গেল ভাস্বতী!

পরদিন অফিসে এসেও কাজে মন বসাতে পারছিল না ভাস্বতী। বাঁধা গতের চিঠি, তাই টাইপ করতেই ভুল হচ্ছে বার বার। ক্ষিধে তেষ্টা চলে গেছে, কী করবে ভাবছে অবিরাম। স্কুলে গিয়ে ছিনিয়ে আনবে বাচ্চাদের? যদি ওখানে একটা ঝগড়াঝাঁটি চেঁচামিচি হয়, বুবলু মুনিয়াকে নিয়ে সবাই হাসাহাসি করবে না? করুক গে, ওদের ছেড়ে থাকা ভাস্বতীর পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু যদি ওরা না আসে? যদি রণজয় ওদের স্কুল ছাড়িয়ে দেয়? পাড়ায় রণজয়ের বিস্তর প্রতিপত্তি, যদি ওখানকার ওই ওঁচা স্কুলটায় ছেলেমেয়েকে ভর্তি করে দেয়? নিশ্চয়ই তাই করবে। বিনা মতলবে কি রণজয় ওদের নিয়ে গেছে?

ভাবতেই শরীর হিম, হাত পা অবশ, হাঁটু শিথিল। রণজয়ের হাতে ওদের ছেড়ে দেওয়াটা কী মুর্খামিই না হয়ে গেছে। রণজয় শাসিয়েছিল তাকে পথে বসাবে, সত্যিই বসাল। এখন কী করে ভাস্বতী?

টিফিনের পর টাইপ রাইটারে মাথা রেখে বসে আছে ভাস্বতী, কে যেন ডাকল। ভাস্বতী চোখ তুলল। অ্যাকাউন্ট্যান্ট রমেশ।

—মিসেস মিত্র, আপনার ফোন।

শরীর টেনে উঠল ভাস্বতী— কে ?

—আপনার হাজব্যাণ্ড।

শব্দ দুটো যেন একটু বেশি চেঁচিয়ে বলল রমেশ। যেন ঘোষণা করল। নাকি এ ভাস্বতীরই মনের ভুল ! তার কান আজকাল বেশি তীক্ষ্ণ হয়ে থাকে। রণজয় আর ভাস্বতীর মধ্যে যে প্যাঁচ পয়জার চলছে, তা এখন অফিসে বেশ ঘূর্ণায়মান রটনা। কত যে প্রশ্ন সকলের, কত আলটপকা সহানুভূতি ! টিটকিরিও আছে। মুখফোড় অসীমা তো একদিন বলেই ফেলল, বরের সঙ্গে আর বুঝি সিনেমা যাও না ভাস্বতীদি !

অনেকেই বক্র চোখে দেখছে, ভাস্বতী দৃকপাত করল না, ফোন তুলল।

—হ্যালো।

—ছেলেমেয়েকে ছেড়ে থাকতে কেমন লাগছে ?

ভাস্বতীর হৃৎপিণ্ড থেমে আছে।

—রাহুলকে ছেড়ে থাকার থেকেও বেশি কষ্ট হচ্ছে ?

ভাস্বতী রিসিভার মুঠোয় চেপে ধরল।

—বুবলু মুনিয়াকে স্কুল থেকে নিয়ে যেও। আমি আজ যাব না।

ভাস্বতীর বুক খালি করে অনেকটা বাতাস বেরিয়ে গেল।

—চুপ মেরে আছ কেন ? মনে রেখ, আমার ছেলেমেয়েকে আমি যখন খুশি তোমার কাছ থেকে নিয়ে যেতে পারি।

ভাস্বতী মনে মনে বলল— দেখা যাবে।

রণজয়ও কয়েক সেকেণ্ড নিশ্চুপ হয়ে আছে। কিছুক্ষণ একটা নীরব তরঙ্গ খেলে বেড়ালো টেলিফোনে।-তারপর শব্দ হয়ে আবার আঘাত হানল ভাস্বতীর কানের পর্দায়—অমার অফারটা কিন্তু এখনও ওপেন আছে। ফিরে এসো। অ্যাণ্ড লিভ রাহুল।

ভাস্বতী টেলিফোন কেটে দিল।

॥ বারো ॥

ভাস্করদের পাড়ায় সম্প্রতি এক অফিস খুলেছে। বাসস্ট্যান্ডের কাছেই। ঠিক অফিস নয়, দোকানও বলা যায়। দুই তরুণ চালায় অফিস কাম দোকানটা। এদের ব্যবসাটা ভারি অদ্ভুত, এরা সব কাজের কাজী। টেলিফোন বিল ইলেকট্রিক বিল জমা দেওয়া থেকে প্লেনের টিকিট কেটে দেওয়া, সেকেন্ডহ্যান্ড মোটরগাড়ি থেকে সিক্সথহ্যান্ড সেলাইকলের সুলুকসন্ধান, গৃহশিক্ষক অথবা গৃহভৃত্য সাপ্লাই, পাত্রপাত্রী, সেলস্ম্যান সেলস্গার্ল, জমি বাড়ি ফ্ল্যাট, কী না এরা জোগাড় করে দিতে পারে! নামটাও ভারিস সুন্দর। ম্যাজিকল্যাম্প।



আলাদিনের সেই আশ্চর্য জিনটাকে এরা বোধহয় পুষে রেখেছে।

দোকান কাম অফিসটি ভারি সুসজ্জিত। কাচের ঘর, ফাইবার গ্লাসের চেয়ার, আলো ঠিকরোনো সানমাইকা বসানো টেবিল, ঝকঝক সাইনবোর্ড...। যেতে আসতে রোজই সাইনবোর্ডটা চোখ টানে ভাস্বতীর। ওমনি একটা করে দীর্ঘশ্বাস ঝরে পড়ে, অজান্তেই।

হায় রে, ভাস্বতীর যদি একটা ম্যাজিকল্যাম্প থাকত!

পুজোর ছুটি পড়া পর্যন্ত প্রতি সপ্তাহে নিয়ম করে একদিন বুবলু মুনিয়াকে বাড়ি নিয়ে গেছে রণজয়, দুটো কচি কচি ছেলেমেয়ের মগজ ধোলাই করেছে, ফিরে এসে মুহ্যমান বসে থাকত ভাই বোন, ধুকপুক বুকে ভাস্বতী ভাবত এই বুঝি রণজয়ের দিকে ওরা আরও এক পা সরে গেল। আশ্চর্য, ভাস্বতীর বাপের বাড়ির লোকরাও ওভাবে ছেলেমেয়ে দুটোকে টানা হেঁচড়া করাতে বিন্দুমাত্র অখুশি নয়, দাদা মা বউদি কেউ না। উল্টে তারা ওতাতায়, কেন যাবি না, নিশ্চয়ই যাবি, ওটা তোদের বাড়ি...আহারে, ছেলেমেয়ে কাছে না



থাকলে বাবার প্রাণ পুড়বে না! সবই পরোক্ষে ভাস্বতীকে ঠেস দেওয়া।

ম্যাজিকল্যাম্প হয়তো বদল ঘটাতে পারত দৃশ্যটার।

রণজয়'প্রতি পদে ভাস্বতীকে হেয় করে চলেছে। মহালয়ার পর দিন বুবলু মুনিয়ার স্কুলে ইয়া বড় এক প্যাকেট নিয়ে এল রণজয়। কি, না ছেলেমেয়ের পুজোর জামাকাপড়। খুলে খুলে দেখাচ্ছে! বুবলু, এই জিন্সটা পছন্দ হয়! সাড়ে তিনশো পড়ল! মুনিয়া, ফ্রকটায় হাত বুলিয়ে দ্যাখ্! কী নরম না! ইটালিয়ান সিল্ক! সাড়ে পাঁচশো! এসি মার্কেটের জিনিস তো, ওখানে আবার লেস্ কস্টলি কিছু পাওয়া যায় না! কাকে শোনাচ্ছিল রণজয়? ছেলেমেয়েকে, না ছেলেমেয়ের মাকে? খুশিতে চকচক করছে বুবলু মুনিয়ার চোখ, বাবার কেনা জামাকাপড়ই তাদের বেশি প্রিয়। ফিরেই দিদাকে দেখাচ্ছে, মামা মামিকে দেখাচ্ছে, আর তারা গলে গলে পড়ছে! অথচ বোনাসের সর্বস্ব ঢেলে ছেলেমেয়ের জন্য পুজোর সওদা করেছিল ভাস্বতী, মা দাদা বউদি পিকলু কাউকেই সাধ্য মতো দিতে কার্পণ্য করে নি। এবং শেষে নিজের জন্য একটা পেটিকোট কেনারও পয়সা ছিল না।

ম্যাজিকল্যাম্প থাকলে হয়তো বুবলু মুনিয়া মার বুকের কষ্টটা অনুভব করতে পারত।

রণজয় হুকুম ছুঁড়ে দিল, অষ্টমীর দিন বিকেলবেলা ছেলেমেয়েকে আমার ফ্ল্যাটে দিয়ে যাবে, ওদের ঘুরিয়ে টুরিয়ে রাত দশটার ছেড়ে দেব, এসে নিয়ে যেও। ভাস্বতী দাঁতে দাঁত চেপেছিল, পণ করেছিল যাবে না, উপেক্ষা করবে রণজয়কে। কিন্তু বুবলু মুনিয়ার ছটফটানি দেখে সেই প্রতিজ্ঞাও...। ছেলে মেয়েকে যাদবপুরে পৌঁছে দিয়ে পুজোর সন্ধ্যেটা শিখাদের টালিগঞ্জের ফ্ল্যাটে গিয়ে শুকনো মুখে বসে রইল ভাস্বতী। আর ফেরার পথে অবিরাম শুনতে লাগল, বাবা আজ বিরিয়ানি খাইয়েছে মা, বাবা আজ আইসক্রিম খাইয়েছে মা! এমন ঢ্যাটা লোক, বিজয়াতে ভাস্বতীর মাকে প্রণাম পর্যন্ত করতে এল না! অবশ্য মা দাদার তাতেও আত্মসম্মানে লাগে না, জামাইয়ের তরফদারি করেই চলেছে। মা তো মুখের ওপর বলে দিল, মেয়ে যা ব্যবহারটা করছে, জামাই আসে কোন্ মুখে! ঘটঘট ঘাড় নাড়ল দাদা, ঠিক ঠিক, বুলুটা আমাদের বড় বেশি জেদি! ওর কপালে এখনও অনেক দুঃখ আছে!

নিজস্ব ম্যাজিকল্যাম্প থাকলে এসব কথা কি সহ্য করতে হত ভাস্বতীকে! জিনটা কি ভাস্বতীর হয়ে ওদের দু কথা শুনিয়ে দিত না! রণজয়ের ওপর প্রতিশোধ নিতে ছেড়ে দিত!

ভাবলেই আরেকটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে ভাস্বতীর। ম্যাজিকল্যাম্প তার কিছুই উপকার করতে পারে না। সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণই জোগাতে পারে

ম্যাজিকল্যাম্প, মানুষে মানুষে সম্পর্ক, হৃদয়, অনুভূতি এসব তার এক্তিয়ারে পড়ে না।

ওই ঝকঝকে সাইনবোর্ড ঝোলানো ম্যাজিকল্যাম্প তার কোনও কাজে লাগবে না।

তবু একদিন ওই ম্যাজিকল্যাম্পের অফিসে ঢুকতে হল ভাস্বতীকে। বাড়ি ফেরার পথে। সন্ধ্যেবেলা। বুবলু মুনিয়ার স্কুল খুলতে তখন হপ্তাখানেক বাকি।

বুবলুর জন্যই তার আসা। ফার্স্ট টার্মে বুবলু অঙ্কে ভাল করে নি, খুব সহজ সহজ অঙ্ক ভুল করেছে পরীক্ষায়, সেকেন্ড টার্ম এসে গেল...। দাদা তো বুবলুর প্রগ্রেস রিপোর্ট দেখেও খুব একটা রা কাড়ল না, বুবলুকে নিয়ে সে যে ভাবিত হতে রাজি নয় এ তো স্পষ্টই বোঝা যায়। ভাস্বতীর সঙ্গে কেমন যেন এক উদাসীন দূরত্ব তৈরী হয়ে গেছে তার।

কাচের দরজা খুলে ঢুকতেই ভেতরের ছেলেটি কেতাবি অভ্যর্থনা জানাল,—আসুন দিদি। বলুন, হাউ আই ক্যান হেলপ্ ইউ ?

—আমি একটা টিউটর...মানে অঙ্কের...

—ওই তো বোর্ডে আমাদের টিউটরদের অ্যাড দেওয়া রয়েছে, আপনি দেখে নিন।

—না না, ঠিক ওরকম নয়। আমার ছেলে গিয়ে পড়বে।

—সে জন্য কোচিং ক্লাস আছে। তারও বিজ্ঞাপন আছে আমাদের।

—আমার ছেলে খুব ছোট। ক্লাস থ্রি।

—ও। চটপটে তরুণ যেন ভাস্বতীর সমস্যা বুঝে গেল,—বসুন দিদি।

বসতে বসতে ভাস্বতী দেখল পাশে একটা টুলে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, উসকো খুসকো চুল এক প্রৌঢ়, তার দিকে তাকিয়ে এক দৃষ্টে।

ভাস্বতী চোখ সরিয়ে সপ্রতিভ মুখে বলল,—আমাদের বাড়িতে স্পেস প্রবলেম, অসুবিধে আছে, তাই চাই ছেলে মাস্টারমশাই-এর কাছে গিয়ে পড়ুক।

—আজকাল তো বাড়িতে সবাই গ্রুপে পড়ায় দিদি, থ্রি-এর তো এক্ষুনি কেউ নেই...এক সেকেন্ড দিদি, আমি একটু খাতাটা দেখে নিই।

ভাস্বতী ঈষৎ শিথিল হল। এদিক ওদিক চোখ ঘোরাচ্ছে। সবুজ ভেলভেট লাগানো বোর্ডে ঝুলন্ত বিজ্ঞাপনগুলো দেখছে।

আলগা ভাবে বলল,—আপনাদের এখানে সিস্টেমটা কি ?

খাতার পাতায় চোখ রেখেই যুবকটি বলল,—কিসের দিদি ?

—এই সব টিউটর ফিউটর পাওয়ার ? আপনাদের একটা চার্জ নিশ্চয়ই দিতে হবে ?

—সামান্যই দিদি। কুড়ি টাকা। এনরোলমেন্ট ফি। ওটা জমা দিলে আমরা আপনাকে টিউটরের নাম ঠিকানা দিয়ে দেব, আপনি কনট্যাক্ট করে নেবেন। চাইলে টিউটরও আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে, তখন তাহলে আপনি কখন অ্যাভেলেবল্ তার স্পেসিফিক টাইম নোট করে দিয়ে যেতে হবে।

—ও। কিন্তু সেই টিউটরকে যদি আমার পছন্দ না হয়?

—তাহলে নেক্সট আরেক জনকে পাঠাব। তখন কিন্তু আপনাকে প্রতি জনের জন্য দশ টাকা করে দিতে হবে।

—বাহ্, মজাদার সিস্টেম তো! ভাস্বতী অল্প হাসল,—তা আপনাদের হাতে এখন আমার রিকোয়্যারমেন্ট মতো টিচার আছে?

—জাস্ট নাউ নেই।...তবে দু একদিনের মধ্যেই...ছেলেটি খাতা বন্ধ করল,—আপনি নাম ঠিকানা দিয়ে এনরোল করে যান না দিদি, আমি আপনার বাড়িতে খবর পাঠাব।

—না না, তার দরকার নেই। ভাস্বতী তড়িঘড়ি বলে উঠল,—আমি নিজেই খবর নিয়ে যাব। বলতে বলতে ব্যাগ থেকে দুটো দশ টাকার নোট বার করে টেবিলে রেখেছে। কি যেন হঠাৎ মনে পড়ল। ভেলভেটের বোর্ডে চোখ বুলিয়ে বলল,—আচ্ছা, বাড়ি ভাড়ার খবর নেওয়ার সিস্টেমটা আপনাদের কি?

—ওই একই। ফার্স্ট বাড়ি কুড়ি, তারপর থেকে দশ। আমাদের লোক গিয়ে দেখিয়ে আনবে। আর বাড়ি সেটল্ হয়ে গেলে দু মাসের ভাড়া আমাদের ব্রোকারেজ দিতে হবে।

— ও বাবা, সে তো অনেক!

—এরকমই তো রেট চলছে দিদি।...আপনার দরকার?...কি রকম দরকার? টু-রুম ডাইনিং? থ্রি-রুম ডাইনিং?

ভাস্বতী এক সেকেন্ড চিন্তা করে নিল,—ওয়ানরুম হলেই চলবে। একটু খাবার জায়গা থাকবে...রান্নাঘর বাথরুম...তবে অল্ সেপারেট।

—তাও আছে। টাকা দিয়ে নাম লিখিয়ে যান...

ভাস্বতী ঘাড় নাড়ল,—না, আজ থাক। এমনিই জিজ্ঞেস করছিলাম...তাহলে টিউটরের ব্যাপারটা পরশু দিন এসে খোঁজ নিয়ে যাব? আমার নভেম্বর থেকে পেলেই ভাল হয়।

—দেখছি দিদি, যত তাড়াতাড়ি পারি।

যুবকটি রসিদ কেটে হাতে ধরিয়ে দিল, উঠে পড়ল ভাস্বতী।

রাস্তায় বেরিয়ে মন্থর পায়ে হাঁটছিল। ছেলে মেয়ে দুটো কী করছে সারা দিন কে জানে! গোটা ছুটি তো হুড়ুদ্দুম করে কাটাল। মুনিয়াও দুই দাদার পিছন পিছন ঘুরে ভারি চঞ্চল হয়েছে আজকাল। কাল লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি

ভাঙতে গিয়ে হাঁটু ছড়ে গেছিল।

—দিদি শুনছেন?

ঘুরে তাকাল ভাস্বতী। ম্যাজিকল্যাম্পে বসে থাকা বুড়ো মতো লোকটা।

—আমায় কিছু বলছেন?

—হ্যাঁ দিদি। আপনি কি সত্যিই বাড়ি খুঁজছেন?

—কেন?

—না, বলছিলেন তো ওখানে।...আমার হাতে একটা বাড়ি আছে। দেখানোর জন্য পয়সা লাগবে না। দালালি এক মাসের। আপনি যা চাইছেন, তেমনটিই আছে। নিখুঁত ওয়ান রুম অল সেপারেট ফ্ল্যাট। ভাড়াও কম। বলছে বারোশো। আমি ওটা হাজার করিয়ে দেব।

ভাস্বতী ভুরু কুঁচকোল,—আপনি ম্যাজিকল্যাম্পের কর্মচারী নন?

—ধুস্। ওদের বাড়ির খবর এনে দিই, আর ও ব্যাটারা কমিশন খায়। মাঝখান থেকে আমাদের বিজনেস্...দালালির মাত্র চার আনা দেয়।...যাবেন দিদি? কাছেই, এই সিমলাই পাড়া লেনে।

ভাস্বতী কথাগুলোকে নিয়ে মাথায় নাড়াচাড়া করল একটু। হাজার খানেকের মধ্যে ঘর পেয়ে গেলে মন্দ হয় না, দাদা বউদির বিরক্তি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। সংসার চালাতে কষ্ট হবে, তবু অনেক স্বস্তি থাকবে মনে। মুখে হয়তো দাদা 'না না, এর কি দরকার ছিল' বলবে, কিন্তু মনে মনে কি খুশি হবে না! তাছাড়া দেখলেই তো আর সত্যি এক্ষুনি নিতে হচ্ছে না!

ঘড়ি দেখল ভাস্বতী,—চলুন।

দু নম্বর বাস টারমিনাসের উল্টো দিকে রাস্তা। মোড়টা ভিড় হয়ে থাকে সর্বক্ষণ। কাটিয়ে কাটিয়ে এগোচ্ছে লোকটা, কথার কামাই নেই।

—আপনাদের ক' জনের ফ্যামিলি দিদি?

—তিন জন।

—আপনারা স্বামী স্ত্রী আর ছেলে?

ভাস্বতী সামান্য বিরক্ত হল,—তা জেনে আপনার কি দরকার?

—তা নয়, বাড়িঅলা ছোট ফ্যামিলি আনতে বলেছিল কিনা।

—তিন জনের ফ্যামিলি ছোট নয়?

—ছোটই তো। এর চেয়ে কম কি হয়! বাড়িঅলাদের সব কিছুতেই বাড়াবাড়ি দিদি। ছোট ফ্যামিলি হবে, দু বছর পর বাড়ি ছেড়ে দেবে...তবে এই বাড়িঅলার একটা দিক ভাল। সেলামি অ্যাডভান্স নেবে না। শুধু ছ' মাসের সিকিউরিটি ডিপোজিট।

তার মানে অফিস থেকে একটা পি এফ লোন তুলতে হবে। মাসে মাসে

শ' তিনেক তো কাটবেই। নতুন সংসার করতে গেলেও খরচা আছে। খাট বিছানা আলমারি চেয়ার টেবিল হাঁড়ি কড়া খুন্তি...। সহসা ভাস্বতীর মন ব্যথায় ছেয়ে গেল। ভবানীপুর থেকে আলাদা হয়ে আসার পর সংসারটাকে একটু একটু করে সাজিয়েছিল। নিজের পছন্দও বটে, অনেকটা নিজের পয়সাতেও বটে। রণজয় সব ভেঙে দিল। অভিমান করে সব রণজয়ের হাতে তুলে দেওয়া কি মুর্খামি হবে? দুজনেই যখন গড়েছে, দুজনেরই সমান সমান ভাগ থাকা উচিত। বুবলু মুনিয়ার খাট বিছানা আলমারি অন্তত রণজয় দিয়ে দিক। দেবে কি?

ডান দিকে এক সরু মতন গলিতে সুড়ুৎ করে ঢুকে পড়েছে লোকটা। একটা পুরনো দোতলা বাড়ির দরজায় দাঁড়াল। জোর জোর কড়া নাড়ছে।

এক স্থূলকায় টাকমাথা ভদ্রলোক দরজা খুলেছে। থ্যাতলানো বাতাবীলেবুর মতো মুখ।

দালাল লোকটা হাত কচলাল,—ইনি ঘর দেখতে এসছেন স্যার।

—অ। লোকটা দরজা আগলে দাঁড়িয়ে আছে, নড়ছে না। অপাঙ্গে জরিপ করল ভাস্বতীকে,—আপনি দেখবেন?

—হুঁ। ভাস্বতী মৃদু মাথা দোলালো।

—কে কে থাকবেন?

—আমি, আমার এক ছেলে, এক মেয়ে।

লোকটার চোখ দুটো একবার দালালের দিক থেকে ঘুরে এল,—আপনার স্বামী থাকবেন না?

—না।

—বাইরে চাকরি করেন বুঝি?

লোকটার প্রশ্ন করার ভঙ্গি ভাল লাগছিল না ভাস্বতীর। বিরস মুখে বলল,—আপনি তো আমাকে বাড়ি ভাড়া দেবেন, স্বামী কোথায় জেনে লাভ কি? আমি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে চাকরি করি...মানে একটা গভর্নমেন্ট আন্ডারটেকিং-এ।

—অ। স্বাধীন মহিলা!

—কেন, স্বাধীন মহিলাকে আপনারা বাড়ি ভাড়া দ্যান না?

লোকটা উত্তর দেওয়ারই প্রয়োজন মনে করল না। দালালের দিকে কটমট তাকাল,—তোমার আক্কেলটা কি বলো তো? কোন খবর না নিয়ে ভদ্দরলোকের বাড়িতে উল্টোপাল্টা যাকে তাকে নিয়ে চলে আসছ? আমি ছোট ফ্যামিলি বলেছি, তা বলে এরকম একলা মেয়েছেলের কথা বলি নি। যত্ত সব।

মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিল লোকটা।

কয়েক মুহূর্তের জন্য ভাস্বতী নিথর। কান মাথা জ্বলে উঠল অপমানে। ছেলে মেয়ে নিয়ে থাকবে ভাস্বতী, তবু সে একলা মেয়েছেলে? লোকটা কী বিশ্রী একটা ইঙ্গিত করল!

দালালটা কি যেন বলতে যাচ্ছিল, হনহন করে হাঁটা শুরু করেছে ভাস্বতী।

লোকটা প্রায় দৌড়ে এসে ধরল,—দিদি, শুনুন। ঘোষবাবুর কথায় কিছু মনে করবেন না। আমি আপনাকে ভাল বাড়ি দেখে দেব।...আপনার হাজব্যান্ড সঙ্গে থাকবেন না বলার দরকার কি? বলবেন বাইরে চাকরি করে, মাঝে মাঝে আসবে। ও দিদি, শুনুন না...

ভাস্বতী তীব্র দৃষ্টিতে লোকটার দিকে তাকাল। গতি বাড়িয়েছে হাঁটার। হঠাৎই।

॥ তেরো ॥

কদিন ধরে ভাস্বতীর অফিস জুড়ে খুব শোরগোল। ভুবনেশ্বরে ভাস্বতীদের নতুন ডিভিশান খুলছে, এখান থেকে নাকি অনেককেই ধরে ধরে বদলি করা হবে, তাই নিয়ে উত্তেজনা। কার কার কপাল পুড়ছে তা নিয়ে গবেষণা চলছে জোর। শিখা এসে বলে গেল, মেয়েদের কোন চিন্তা নেই। খোদ জি এম নাকি বলেছেন মেয়েরা না চাইলে কলকাতা থেকে তাদের অন্তত পাঠানো হবে না কোথাও। ছেলেরা এই নিয়ে টিকাটিপ্পনি কাটল অনেক।

শিখার সংবাদটায় ভাস্বতী খুব খুশি হতে পারল না। বাইরে চলে যেতে পারলে বেশ হত। নিজের মতো করে ছেলেমেয়ে নিয়ে থাকা যেত, রণজয়ের উৎপাত আর সহ্য করতে হত না। রণজয় কি ভাববে ভাস্বতী ভয় পেয়ে পালালো ?

এমন সব সাত পাঁচ চিন্তার মাঝে রাহুল এসেছে অফিসে। মুখটা যেন একটু শুকনো শুকনো। গম্ভীর।

ভাস্বতী হেসে বলল,--কি ব্যাপার, তোমার দেখা নেই কেন ? সেই মাসের পয়লা তারিখে এক দিন মুখ দেখিয়ে চলে গেলে...অসুখ টসুখ করেছিল নাকি ?

—নাহ্। এমনিই। রাহুলকে তেমন সপ্রতিভ দেখাল না।

—তবে ? নাটক ?

—না, তাও না।...তুমি একটু নীচে আসবে ?

—কেন ?

—এসো না। কথা আছে।

রাহুলের স্বর যেন কেমন অন্য রকম। চোখও ঠিক স্বাভাবিক নয়, একটু অন্যমনস্ক। ভাস্বতীর সামান্য খটকা লাগল। ব্যাগ কাঁধে নেমে এল রাহুলের পিছু পিছু।

এক তলার ক্যান্টিনে এসে খানিকটা স্বচ্ছন্দ হয়েছে রাহুল। কথা বলছে এতাল বেতাল। নাটকের মহলা বন্ধ এখন, অন্য একটা গ্রুপ বড় রোল করার জন্য তাকে ডাকছে, কোন্ বন্ধুর এগজিবিশানে চারটে স্কালপ্চার বিক্রি হল, এই সব।

এই কথা বলতে ডেকেছে রাহুল ? মনে হয় না। কথা বলছে রাহুল, তবু যেন উন্মন বার বার।

বিস্বাদ চায়ে চুমুক দিয়ে ভাস্বতী বলল—আজে বাজে কথা ছাড়, কাজের কথা বল।

—বলছি। তাড়া কিসের ? রাহুল ধীরে সুস্থে একটা সিগারেট ধরাল—তোমাদের অফিসে তো কেউ আড়াইটের আগে টিফিন সেরে ঢোকে না।

ভাস্বতী অপ্রসন্ন মুখে চারদিকে তাকাল। একটা বিশ্রী ভনভন শব্দ ঘুরছে ঘরটায়, ভাল লাগছে না একটুও। মাথায় এত চিন্তা। পরশু দাদা কী তুচ্ছ বিষয় নিয়ে বাড়ি তুলকালাম করল ! বাজার এনে রান্নাঘরে রেখেছিল দাদা, ঘটনাচক্রে ভাস্বতীও তখন রান্নাঘরে, বুবলু মুনিয়ার টিফিন তৈরি করছে, হতভাগা এক বেড়াল এসে দু'টুকরো মাছ মুখে করে নিয়ে চলে গেল। দাদা রেগে কাঁই, ভাস্বতীকে সরাসরি কিছু না বলে বউদির ওপর চোটপাট করল খুব। জানই তো বুলু নিজেকে আর নিজের ছেলেমেয়ে ছাড়া দুনিয়ার কিছু চেনে না, তুমি একটু নজর রাখতে পারো না ! বউকে মেরে বোনকে শেখানো !

ভাস্বতী তাও ঠাণ্ডা মাথায় বলেছিল, আমার ছেলেমেয়ে তো মাছ খেতে চায় না, ওদের আজ নয় নাই দিলে।

শুনে দাদা রণমূর্তি। তুই আমাকে ইনসাল্ট করছিস বুলু ! এরপর বলবি দু পিস মাছের দাম দিয়ে দিচ্ছি ! কী কথার কী অর্থ ! তাও যদি সত্যি মুফতে থাকত ভাস্বতী। মাস গেলে হাজারটি করে টাকা দেয়, লাগবে না লাগবে না করে হাত পেতে নিয়ে নেয় দাদা। মাছ নিয়ে কুরুক্ষেত্রটা যে বাহানা তা কী ভাস্বতী বোঝে না !

রাহুল গাঁজাড়ুর মতো টান দিল সিগারেটে—আমি একটা কথা ভাবছিলাম ভাস্বতীদি। যদি আমাকে ভুল না বোঝ তো বলতে পারি।

—কেন ? কী এমন কথা ?

—বলছিলাম...রাহুল চারপাশ একবার দেখে নিয়ে গলা নামাল—আমি কি একবার রণোদার সঙ্গে বসব ?

—কেন ?

—না মানে...আফটার অল আমিই তো ঝামেলার মূল।

—কে বলল ?

—আমি কি বাচ্চা ছেলে ভাস্বতীদি ?...সব বুঝি। বুবলু মুনিয়ার স্কুলে আমাকে দেখলে রণোদার চোয়াল শক্ত হয়ে যায়, কথা বলতে গেলে নিমপাতা খাওয়া মুখ করে থাকে...। রাহুলের মুখে সবজান্তা হাসির রেখা—তোমার অফিসও আমার অচেনা নয় ভাস্বতীদি. সেখান থেকেও দ-চারটে কমেন্ট

আমার কানে এসেছে।

ভাস্বতী চোখ নামাল—আগে তো এসব কথা বল নি ?

—ভাবি বলব। বলা হয় না।...যাক গে, বলো বসব ? আমি হয়তো তোমাদের মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিংটা মিটিয়ে দিতে পারি।

—কী উপায়ে ? বলবে ভাস্বতীদি আমার দিদির মতো ? মায়ের পেটের দিদির থেকেও বেশি ? বিশ্বাস করুন, আমাদের মধ্যে কোনও গুপ্ত সম্পর্ক নেই ? নিজের দিদি বিদেশ চলে গেছে বলেই... ? ভাস্বতীর স্বরে শ্লেষ ঝরছে।

রাহুল মাথা ঝাঁকাল—দূর, ওসব কথা বলব কেন ?

—তা হলে ?

—বলব, আমি আর কখনও ভাস্বতীদির সঙ্গে দেখাই করব না। বলব, আপনারা সুখে ঘরকন্না করুন, আমায় টা টা করে দিন।

—মিথ্যে বলবে ?

—মিথ্যে কেন ? সত্যিই বলব। রাহুলের স্বর হঠাৎ ভারী হয়ে গেল,—এই বিশ্রী ঘটনার এবার ইতি হওয়া দরকার। আমার জন্য তোমাদের সংসার নষ্ট হয়ে যাক, বুবলু মুনিয়ার ফিউচার অ্যাফেক্ট করুক, এটা কোনও কাজের কথা নয় ভাস্বতীদি। আই শুড এগজিট। অ্যান্ড এগজিট গ্রেসফুলি।

ভাস্বতী রাহুলের চোখের দিকে সরাসরি তাকাল। পড়তে চাইল মায়াবী ছেলেটাকে। মুখে হাসি টেনে বলল—তুমি সরে গেলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, এমন বিশ্বাস কী করে এল ?

রাহুল উত্তর দিল না। রঙ্‌জ্বলা টিনের অ্যাশট্রেতে সিগারেট গুঁজে ভাবছে কী যেন।

ভাস্বতী শান্ত স্বরে বলল— শোন রাহুল, তোমার এখনও জীবনের অনেক দিকই দেখা হয়নি। সন্দেহ ব্যাপারটা এমনই, সেটা কোনও ব্যাক্তি বিশেষের ওপর নির্ভর করে না। মানুষের মনে সন্দেহের বীজ আগেই দানা বাঁধে, পরে মানুষ তার আধার খোঁজে। নাহলে ওথেলো কি তুচ্ছ কেসিওকে নিয়ে ডেসডিমোনাকে সন্দেহ করতে পারত ? হয়তো এটাই তাদের ভালোবাসার ধরণ।...তোমার রণোদাও সেরকমই। এক রাহুল চলে গেলেই কি তার মনের কাঁটাটা চিরতরে নির্মূল হবে ?

—কেন হবে না ? রাহুল তর্ক জুড়তে চাইল।

—তোমার ওসব ছেলেমানুষি প্ল্যান ছাড়ো। ভাস্বতী রাহুলকে থামিয়ে দিল— যেমন আসছ আসবে, মিশছ মিশবে, নইলে আমি নিজের কাছে ছোট হয়ে যাব। ...যাক গে যাক, অনেক বাজে বকলে, এবার একটা দরকারি কথা শোনো। আমার একটু উপকার করতে পারবে ?

—কী ? রাহুল সামান্য অন্যমনস্ক।

—আমায় একটা বাড়ি খুঁজে দিতে পারবে ? বলবে না বলবে না করেও ভাস্বতী বলে ফেলল।

—হঠাৎ !

—তোমাকে তো আগেই বলেছি, দুনিয়ায় কিছুই হঠাৎ ঘটে না।

রাহুল চুপ করে রইল।

ভাস্বতী আবার বলল— পারবে কি না বলো। ছোট্ট টু রুম, দেড়খানা ঘর হলেও চলবে। মোটামুটি জল-টল থাকবে, পাড়াটা সভ্য-ভদ্র হবে...আর একটু সেপারেট। তোমার রণোদার পাড়াতেও নয়, পাইকপাড়াতেও নয়। বুঝতেই পারছ কেন বলছি।

রাহুল ঘাড় নাড়ল, তবে উৎসাহ দেখাল না। চাপা গলায় বলল—একা মেয়েকে সহজে কেউ ঘর ভাড়া দেয় না ভাস্বতীদি।

ভাস্বতী মনে মনে বলল, জানি। মুখে বলল,—একা কেন ! ছেলেমেয়ে সঙ্গে থাকবে।

—ওই হল। সঙ্গে পুরুষ কেউ না থাকলে মেয়েদের একাই বলে।

এসব কথায় ভাস্বতী এখন অভ্যস্ত, গায়ে মাখল না। বলল—হুঁ। সেই জন্যই তো তোমাকে বলা। তোমাদের ওদিকে দ্যাখো না...দালাল-ফালালকে বলো... হরিদেবপুরের দিকে ভাড়াটাও নিশ্চয়ই একটু কম হবে। জানোই তো আমার কী রোজগার।

—দেখব। রাহুল আরেকটা সিগারেট ধরাল—আমার অন্য কথাও ছিল ভাস্বতীদি।

—বলো বলো, চটপট বলো। ভাস্বতী ঘড়ি দেখছে।

—আমি তোমার কাছে একটা অনুমতি চাই। রাহুল অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল—আমার বিয়ের ঠিক হয়েছে ভাস্বতীদি। অঘ্রানের সাতাশে।

—বাহ্ এ তো খুব আনন্দের খবর। এতে আমার অনুমতির কী আছে ?

রাহুল ঝট করে মুখ ফেরাল, বিশ্বাস করো, বাবা মা খুব জোর করল, বারণ শুনল না।

—বারণ করছিলে কেন ? ভাস্বতী অবাক মুখে তাকাল—মেয়ে তোমার পছন্দ নয় ?

—তা ঠিক নয়...মেয়ে ভালই ব্যাংকে চাকরি করে, বেশ স্মার্ট, জলি... কালচারাল দিকেও ইন্টারেস্ট আছে। ইনফ্যাক্ট আমার নাটকও দেখেছে। রাহুল কয়েক সেকেন্ড থেমে রইল। যেন ক্যান্টিনের কলরোল শুনছে। তারপর হঠাৎই ভাস্বতীর হাত চেপে ধরেছে। করুণ মুখে বলল—তুমি রাগ কোরো না

ভাস্বতীদি। খোলা মনে অনুমতি দাও। আমার কথা মিলিয়ে নিও, সব মিটে যাবে।

ভয়ঙ্কর এক ক্রোধের অনল জ্বলে উঠল ভাস্বতীর শরীরে। রাহুল ভাবে কী! ভাস্বতী কি স্ত্রীমাকড়সা, তার জালে আটকে আছে রাহুল!

পরমুহূর্তে অদ্ভুত এক শৈত্য অনুভব করল ভাস্বতী! রাহুল তার বন্ধু কেন হবে, সেও তো পুরুষই।

রণজয়ের ছেটানো ক্লেদ এতদিন পরে যেন গায়ে লাগছিল ভাস্বতীর। ঘেন্না আসছে, ভীষণ ঘেন্না আসছে।

রাহুল যেন রণজয়ের থেকেও বেশি অপমান করল তাকে। এটাও বুঝি পাওনা ছিল। ভালই হল, এবার অনেক নির্মোহ হতে পারবে ভাস্বতী।

হাসল ভাস্বতী। বলল— নেমন্তন্ন কোরো কিন্তু। বুবলু মুনিয়াকেও বাদ দিও না।

অফিসে ফিরে টাইপরাইটারের সামনে বসে ভাস্বতী আপন মনে হাসছিল। কেন হাসছে নিজেও জানে না। যেন পাহাড় ফেটে গোপন প্রস্রবণের মুখ খুলে গেছে, অন্তহীন বুদ্বুদের মতো উঠে আসছে হাসিটা।

।। চোদ্দ ।।

সাতটা দিনও গেল না, রণজয় এসে হাজির। ভাস্বতীদের পাইকপাড়ার বাড়িতে।

রবিবারের সকাল, এক রাশ কাপড় কেচে ছাদে মেলছিল ভাস্বতী। পিকলু ছাদে ঘুড়ি ওড়াচ্ছে, বুবলুর হাতে লাটাই, মুনিয়া উৎসাহী দর্শক। ভাস্কর বাড়ি নেই, ব্যাংকের কোনও বন্ধুর কাছে গেছে। হিমানী জপে বসেছেন। রিনা রান্নাঘরে।

রিনাই নিচ থেকে ডাকল—বুলু, বুলুউউ, রণজয়দা এসেছেন।

ভাস্বতীর ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি ফুটে উঠল, ঘন কুয়াশায় আকাশ পারে টুকরো রোদের মতো। যেন জানতই রণজয় আসবে।

বাবার নাম শুনেই বুবলু মুনিয়া লাফাতে লাফাতে নীচে নেমে গেছে। ঘুড়ি নামাচ্ছে পিকলুও। ভাস্বতী বেশ খানিকটা সময় একা একা দাঁড়িয়ে রইল ছাদে। অদূরে অতিকায় জলাধার স্পষ্ট এখন, দৃশ্যমান তার নীচের আবছা আঁধারটাও। যেন অজস্র মানুষের তৃষ্ণা মেটাতেই ওই আধারতলে ক্লান্তি নেমেছে, ভাস্বতীর মনে হল।

দোতলায় নেমে ভাস্বতী দেখল হিমানীর ঘরে ছোটখাটো এক উৎসব শুরু হয়ে গেছে। দিন পনেরো বাবাকে দেখেনি বুবলু মুনিয়া, তারা একেবারে আহ্লাদে ডগমগ, কলকল করছে। রিনা লুচি ভাজতে বসে গেছে রান্নাঘরে। হিমানীর জপও শিকেয়। তাঁর শরীর নিয়ে সুবোধ বালকের মতো প্রশ্ন করছে রণজয়, তিনিও প্রফুল্ল মুখে জবাব দিয়ে চলেছেন। গোটা দৃশ্যটাই আনন্দের এক নিসর্গ চিত্র।

ভাস্বতীকে দেখে সামান্য আড়ষ্ট হল রণজয়।

হিমানীর মায়ের চোখ, ধরেছেন ঠিক। বললেন—এই বুলু, জামাইকে নিয়ে পিকলুর ঘরে বসা না।

হাসিটা ভাস্বতীর মুখে ধরাই আছে। বলল—কেন মা, ও তো এ ঘরে

বসেইছে।

—আহ্ বুলু, মানুষটা কদ্দিন পর এল...এই হাটের মাঝে কি স্বামী স্ত্রীর-কথা হয় ?

—তাও তো বটে। ভাস্বতী ঘাড় দোলাল। ডাকল রণজয়কে—এসো।

রিনা এর মধ্যেই পিকলুর ঘর ফিটফাট করে দিয়েছে। বইখাতা গুছোনো, নিভাঁজ চাদর, দরজায় পর্দা টানটান। পিকলুকে মিষ্টি কিনতে পাঠিয়েছিল, ছেলে ফিরতেই ঝকঝকে প্লেটে লুচি তরকারি সন্দেশ সাজিয়ে দিয়ে গেছে।

পিকলুর চেয়ার টেবিলে খাচ্ছে রণজয়। দরজা ভেজিয়ে ভাস্বতী খাটে বসল। বলল— মিষ্টিগুলো খাবে ? তোমার না সুগার ?

রণজয় শশব্যস্ত হয়ে মিষ্টির প্লেট সরিয়ে দিল। আড়চোখে দেখল ভাস্বতীকে— আমি তোমাদের নিয়ে যেতে এসেছি স্বাতী।

হঠাৎ ? বলতে গিয়েও ভাস্বতী কথাটা জিভে পুরে নিল। এ দুনিয়ায় তো কিছুই হঠাৎ হয় না। সবেরই জমি লাগে, কার্যকারণ থাকে। তাহলে রাহুল... !

ভাস্বতী অল্প মাথা নাড়ল— হুঁ।

রণজয় সন্তর্পণে লুচি ছিঁড়ল—অ্যাই অ্যাম সরি স্বাতী। আমার অন্যায় হয়ে গেছে। আমায় ক্ষমা করে দাও।

ভাস্বতীর মুখে হাসিটা ফিরে এল—হুঁ।

রণজয় যেন খানিকটা জোর পেয়ে গেল। গলা খাঁকারি দিয়ে বলল—আমার যে কী মতিভ্রম হয়েছিল ! আমি কি না শেষে ওই বাচ্চা ছেলেটাকে নিয়ে তোমায় সন্দেহ করেছিলাম ! সামান্য একটা কারণে তুমি কত কষ্ট পেলে, ছেলেমেয়ে দুটো সাফার করল, আর আমি তো... ! রাহুল আমার চোখ ফুটিয়ে দিয়েছে স্বাতী।

—বুঝলাম।...খেয়ে নাও, লুচি ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

—হ্যাঁ খাই। ঝটপট একটা গোটা লুচি তরকারি সমেত মুখে চালান করল রণজয়। শেষ করে একটু জল খেল—তুমি রাহুলের বিয়েতে যাচ্ছ তো ?

—ভাবছি।

—ভাবাভাবির কিছু নেই, আমরা সবাই যাব। কী প্রেজেণ্ট দেওয়া যায় বলো তো ?...দামি একটা কিছু তো দিতেই হয়। যেন রাহুলের মনে কোনও ক্ষোভ না থাকে।

ভাস্বতী বলল না কিছু, শুধু শুনছে। দেখছে রণজয়কে। রণজয়ের মুখে চোখে বিন্দুমাত্র গ্লানি নেই, এই মুহূর্তে রণজয় যেন খুশির পদ্মবিল।

রণজয় প্রসন্ন মুখে আরও দুখানা লুচি খেল। তরকারির কাঁচা লঙ্কা পড়েছে

পাতে, কুচকুচ করে খাচ্ছে। এক সময়ে ঘরের নীরবতা টের পেল। খাওয়া থামিয়ে বলল— তুমি আমাকে শাস্তিটা দিয়ে ভাল করেছ স্বাতী। আমি একদম অন্য মানুষ হয়ে গেছি। এবার থেকে আমরা একেবারে নতুন ভাবে জীবন শুরু করব। এগারো বছরে যত তিক্ততা তোমার মনে জমা হয়েছে, সব আমি মুছে দেব। সব। মদ তো ছাড়ছিই...

—কিন্তু অংশু বলছিল তা নাকি হয় না। ভাস্বতী কথা শেষ করতে দিল না রণজয়কে। অকস্মাৎ প্রগলভ হয়ে উঠেছে—অংশু বলে, যে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক অন্য কোনও এক তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির ওপর নির্ভর করে, সে সম্পর্ক নাকি কিছুতেই জোর করে টিকিয়ে রাখা যায় না।

রণজয়ের হাত প্লেট থেকে সরে গেল। চোখ স্থির— কে অংশু ?

—ওহো, তোমার সঙ্গে তো তার পরিচয় নেই। মনে মনে এক অংশুকে বানানোর খেলায় মেতে উঠল ভাস্বতী, আমার কলেজের বন্ধু। মাস খানেক আগে হঠাৎ একদিন ক্যামাক স্ট্রিটে দেখা, আমাদের অফিসের সামনেই। দিল্লীতে ছিল, কমপিউটার কোম্পানিতে, রিসেণ্টলি কলকাতায় বদলি হয়ে এসেছে।

—তাকে বুঝি তোমার সব কথা বলেছ ?

—বলতে চাইনি। অংশুই খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জেনে নিল। খুব বন্ধু ছিল তো এক সময়ে, কলেজে এক সঙ্গে কত গানের প্রোগ্রাম করেছি।

—ম্যারেড ?

—জিজ্ঞেস করিনি। অংশু ম্যারেড কি ব্যাচেলার তাতে আমার কী এসে যায়! ফ্রেণ্ড ইজ ফ্রেণ্ড। নয় কি ?

—আগে তো কখনও এর কথা শুনিনি ? রণজয়ের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ।

—তাতে কী আছে! এবার আলাপ করিয়ে দেব। দেখবে কী সুন্দর করে কথা বলে।

রণজয় উঠে দাঁড়িয়েছে। মুখ লাল। লাল, না কালো ? চাপা স্বরে বলল— ভেবেছিলাম তুমি এবারে বদলেছ।

ভাস্বতীর স্বর আরও চাপা, আরও তীব্র— তুমি বদলেছ নিজেকে ?

রণজয় চলে গেল।

ভাস্বতী আবার ছাদে উঠল। ত্বরিত পায়ে। কার্নিশে দাঁড়িয়ে বিলীয়মান রণজয়কে দেখছে। মাঠের গায়ে চওড়া রাস্তা, ছাতা হাতে হেমন্তের রোদে কুঁজো হয়ে হাঁটছে লোকটা। বড্ড রোগা হয়ে গেছে, হাঁটাটাও বড় শ্লথ, যেন

পা টেনে টেনে চলছে। আকাশের দিকে চোখ তুলে একবার তাকাল, আবার হাঁটছে। মাত্র চল্লিশেই রণজয় বুড়িয়ে গেল। কেন যে নিজেরই তৈরি করা জালে নিজেই আটকে যায় মানুষ!

চোখ বুজে লম্বা একটা নিশ্বাস নিল ভাস্বতী। সামনে এখন কত কাজ। মাথা গোঁজার একটা পাকাপোক্ত ঠাঁই খোঁজা দরকার আগে। অফিসে রমেশবাবুরা বলাবলি করছিল, নিজে থেকে দরখাস্ত দিলে এখনই ভুবনেশ্বর পাঠিয়ে দেবে। ভাস্বতী বদলিটা চেয়ে নেবে? নাকি এখানে থেকেই...? আরও কত কাজ। ডির্ভোসের মামলা করার জন্য ভাল একটা উকিল খুঁজতে হবে, ছেলেমেয়ের দখল নিয়ে লড়াই করতে হবে, বুবলু মুনিয়াকে মানুষের মতো মানুষ করতে হবে...

একা একা এখন অনেকটা পথ যেতে হবে ভাস্বতীকে।